সীদী আলী রঈসের দেখা ভারত

সংকলন

প্রেমময় দাশগুপ্ত

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * ১৯৬০

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৮০

মুদ্রক :
নায়ক প্রিন্টার্স
৮১/১ই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

একমাত্র ভগ্নীপতি

প্রয়াত বিপ্লবী ও সেবাব্রতী

খগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী-কে

জীবনের দূরত্ব থেকে

আমাদের কথা

অতীতে ভারতের বুকে যে সব বিদেশী পর্যটক তাঁদের চরণচিহ্ন এঁকে গেছেন, তাঁদের সকলে না হলেও কিছু পর্যটক তাঁদের দেখা ভারতের কাহিনী ও ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা উত্তরকালের জন্য লিখে রেখে গেছেন। তাঁদেরই একজন সীদী আলী রঈস। এসব কাহিনী একদিকে যেমন ভ্রমণ-সাহিত্য, অন্যদিকে তেমনি ইতিহাসের উপাদান। এর মধ্যে অনেকের লেখা কাহিনীই রম্যতায় ও বৈচিত্র্যে উপন্যাস বা অ্যাডভেনচার কাহিনীর চেয়েও মনোরম। আর সব চেয়ে বড় কথা এগুলি কাল্পনিক নয়, সত্যিকারের জীবন-উপন্যাস ও অ্যাডভেনচারের কাহিনী। আমাদের স্মৃতির কুঠরী থেকে হারিয়ে যাওয়া অনেক কালপর্বের ইতিহাসকে, অনেক অজানা ঘটনাকে এ থেকে আমরা জানতে পারি। জানতে পারি আমাদের গৌরবের পাশাপাশি দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতাকেও, অতিমাত্রায় অভ্যস্ত বলে যেগুলি সহজে আমাদের নিজেদের চোখে ধরা পড়ে না। ইতিহাসের পুরো মালাটিকে গেঁথে তুলতে এগুলি আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে, করছে।

এর আগে আমরা বের করেছি এই পর্যায়ের আরও নয়খানা গ্রন্থ—ফা-হিয়েন, মারকো পোলো, অলবেরুনী, ইৎসিঙ, মানুচি, ইবন বাতুতা, তিব্বতী পরিব্রাজক, হিউয়েন সাঙ ও লিনসকোটেন।

আশা করি, এ গ্রন্থটিও তার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সম্পদ-গুণে আগেরগুলির মতোই পাঠকের মনে সাড়া জাগিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

প্রকাশক

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৪২	২	চখতাই	চঘতাই
৫৪	১-৬		

আছে :

মহান তিনি সত্যিকারের তৃপ্ত যেজন অন্নটুকুই পেলে সকল
রাজার চেয়েও সুখী—অল্পে খুশী বলে

হবে :

মহান তিনি সত্যিকারের তৃপ্ত যেজন অন্নটুকুই পেলে।
সকল রাজার চেয়েও সুখী অল্পে খুশী বলে॥

সীদী আলী রঈসের দেখা ভারতবর্ষ
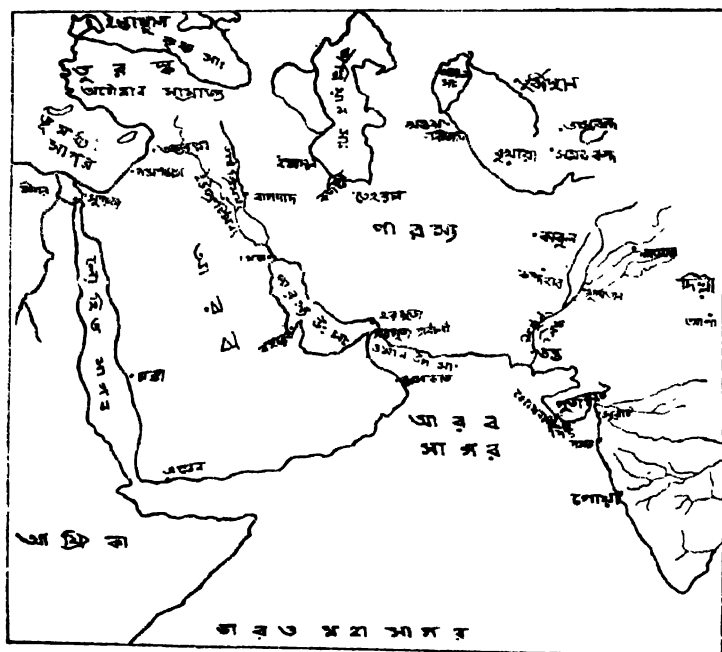
॥ এক ॥

—পূর্বাভাস—

এ কাহিনীর যখন আরম্ভ, তুরস্ক বা তুর্কীর ওসমান (অটোমান) সাম্রাজ্য তখন তার প্রতিপত্তির চূড়ান্ত শিখরে। সাম্রাজ্যের মসনদে এ সময়ে সুলেইমান দ্য ম্যাগ্নিফিসেণ্ট বা রাজশ্রেষ্ঠ সুলেইমান কানুনী (১৫২০-৬৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

সুলতান সুলেইমানের এক তুঙ্গ কর্মচারী মিশরের বেগলার-বে (=অমীরদের অমীর বা অমীর-উল-উমরা) খদীম সুলেইমান পাশা নৌ-দক্ষতা ও নৌ-সমরে খ্যাতি ও বিশিষ্টতা অর্জন করেন। হিজরী ৯৩৭ বা খ্রীষ্টাব্দ ১৫৩০-এ তিনি সুয়েজ থেকে এক নৌ-বহর নিয়ে ইয়েমেন ও এডেন অধিকার করার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু অভিযান করা আর হয়ে উঠলো না। ডাক এল সুলতানের কাছ থেকে। সুলতান সুলেইমান তখন বাগদাদ অভিযানে চলেছেন। তাতে অংশ নেয়ার জন্য যেতে হল সুলেইমান পাশাকে। তার সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ এসময়ে তাকে ওয়াজীরের সম্মানে ভূষিত করলেন সুলতান। বাগদাদ অভিযান শেষ হবার পর আবার পূর্ব-দায়িত্বে ফিরে এলেন সুলেইমান পাশা।

এদিকে ভারতবর্ষে ওই ১৫৩০-য়েই মুঘল সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন হুমায়ুন। ১৫৩৫-এ করলেন তিনি গুজরাট অভিযান। গুজরাট অধিপতি সুলতান বহাদুর বিপাকে পড়ে সামরিক সাহায্যের আবেদন জানিয়ে তুর্কী সম্রাটের কাছে দূত পাঠালেন। হিজরী ৯৪৩ বা খ্রীষ্টাব্দ ১৫৩৬-এ অ্যাড্রিয়ানোপলে তার দূত সম্রাট সুলেইমানের সঙ্গে দেখা করলেন। এদিকে সুলতান

বহাদুর ও হুমায়ুনের মধ্যে বিবাদের সুযোগ নিয়ে পর্তুগীজরা গুজরাটের দমন এবং বসেইনের ওপর আধিপত্য ছাড়াও দিউতে দুর্গ তৈরির অধিকার লাভ করেছে। প্রথম ঘটনাটির চেয়ে দ্বিতীয় ঘটনাটিই তুর্কী সম্রাটকে উদ্বিগ্ন করল বেশি। কেননা, ভারত-মহাসাগর এলাকায় বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য সেও তখন সমান ভাবে উদগ্রীব। পর্তুগীজদের কাছ থেকে এই অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে ১৫৩৮-এ (হিজরী ৯৪৫) পারস্য উপসাগর কূলস্থিত বসরা বন্দরটি অধিকার করল। স্থাপনা করল সেখানে তুর্কী নৌ-ঘাঁটি। এই একই সময়ে প্রধান ভাবে পর্তুগীজ আধিপত্য নাশ ও গৌণভাবে সুলতান বহাদুরকে সাহায্যের জন্য পাঠানো হল মিশরীয় নৌ-বহর সহ খদীম সুলেইমান পাশাকে।

আশিটি জাহাজের এক সুসজ্জিত বহর নিয়ে হিজরী ৯৪৫-এর ১৫ই মহরম (১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) সুয়েজ ত্যাগ করলেন সুলেইমান পাশা। উপস্থিত হলেন লোহিত সাগর পার হয়ে আরব-ভূমির দক্ষিণ উপকূলে এডেনে। এই বিরাট রণতরীর বহর দেখে আতঙ্কিত এডেন অধিপতি অমীর-বিন-দায়ূদ তুর্কী সম্রাটের অধীনতা স্বীকার ক'রে নিলেন। অর্থাৎ ১৫৩০-এ শেষ মুহূর্তে পরিত্যক্ত অভিযানের উদ্দেশ্য এ সময়ে আংশিক ভাবে পূর্ণ হল। এরপর গুজরাটের দিকে এগিয়ে গেলেন সুলেইমান পাশা। আক্রমণ করলেন পর্তুগীজদের। সফল অভিযান চালিয়ে দখল করলেন কুকলি ও কেট (করাচী জেলার কেটি বন্দর) দুর্গ দুটি। তারপর এগিয়ে এলেন দিউ-র দিকে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক কিছু ওলট পালট ঘটে গেছে। গুজরাট বিজয়ের পর তা আবার হাতছাড়া হয়ে গেছে হুমায়ূনের। শের শাহের অভ্যুদয়ে তার দিল্লীর সিংহাসনও টলমল প্রায় (১৫৪০-এর শেষার্ধে শের শাহ দিল্লী অধিকার করেন)। অন্যদিকে গুজরাট পুনরুদ্ধারের পর সুলতান বহাদুরও মারা গেছেন (১৫৩৭)।

রাজ্যের উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করেছে তার ভাইপো মাহমুদ খান (মাহমুদ শাহ তৃতীয়, মে, ১৫৩৮)।

সম্রাট সুলেইমানের মূল নির্দেশ ছিল পর্তুগীজ রণতরীর বহর ধ্বংস করার। কিন্তু যে কারণেই হোক সেদিকে অগ্রণী না হয়ে দিউ অবরোধ করলেন সুলেইমান পাশা। কয়েকমাস ধরে চলল এই অবরোধ। তিনদিক সাগর দিয়ে ঘেরা শক্তিশালী দুর্গটি প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুর্গস্থিত সৈন্যদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে আসা সত্ত্বেও দুর্গ অধিকারে সফল হলেন না সুলেইমান পাশা। বাধ্য হলেন অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে যেতে।

তুর্কী ভাষ্য থেকে জানা যায়, পর্তুগীজদের দেয়া নানা প্রতিশ্রুতিতে বিপথ চালিত হয়ে গুজরাট সরকার তুর্কী নৌ-বাহিনীকে খাদ্য ও সমর উপকরণ যোগাতে অস্বীকার করার দরুনই তারা অভিযান অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রকৃত কারণ খুব সম্ভবতঃ কিছুটা অন্যরূপ। গুজরাটীদের ওপর তুর্কী শাসিত পরাধীন প্রজার ন্যায় ব্যবহারের দরুনই বোধ হয় উভয়ের সম্পর্ক মধ্যে ফাটল ধরে। এখানে উল্লেখযোগ্য, সুলেইমান পাশা তার দাম্ভিক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

গুজরাট বা পর্তুগীজ দমন অভিযানে সুলেইমান পাশা ব্যর্থতা অর্জন করলেও কিছুকাল পরে আরব উপকূলের এডেনের পর ইয়েমেন, মক্কা ও মদীনা অধিকারে সফল হলেন।

সম্রাট সুলেইমান কিন্তু ভারত মহাসাগর থেকে পর্তুগীজ আধিপত্য নাশের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না। করা হল সে জন্য আরেক অভিযানের পরিকল্পনা। ছোট-বড় তিরিশটি রণতরীর এক বহর সহ মিশরীয় নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ পীরী বে-কে পাঠানো হল হরমুজ দ্বীপ ও বন্দর দখল ও পর্তুগীজ নৌ-ক্ষমতা নিঃশেষের জন্য। হিজরী ৯৫৯ (১৫৫১)-তে।

লোহিত সাগর অতিক্রম করার বেলা কুয়াশা ও দুর্যোগপূর্ণ

আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে গতি করতে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল পীরী বে-র বহর। কয়েকটি জাহাজ হারিয়েও গেল। অবশিষ্টদের জড়ো ক'রে ওখান থেকে মসকাত গেলেন তিনি। আক্রমণ ক'রে জয় ক'রে নিলেন সেখানকার পর্তুগীজ দুর্গটিকে। দুর্গের অধিবাসীদের সবাইকে বন্দী করা হল। তারপর হরমুজ এবং বরখত দ্বীপদুটিও আক্রমণ করলেন। যখন দেখতে পেলেন হরমুজের পর্তুগীজ বাহিনী তাদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী তখন অবরোধের পরিকল্পনা ত্যাগ ক'রে পিছু হটে এলেন। ফিরে এলেন মসকাত। এখানে এসে দুর্গের বন্দী অধিনায়কের কাছ থেকে জানতে পেলেন, পর্তুগীজদের টহলদার রণতরীর বাহিনী শীঘ্রই এখানে এসে পড়বে। তখন তাদের প্রাণ নিয়ে পালাবার সুযোগও মিলবে না। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রাণ এবং রণতরীগুলিকে বাঁচাবার জন্যে সবাইকে বসরার তুর্কী নৌ-ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। নিজে তিনখানি জাহাজ নিয়ে ফিরে চললেন সুয়েজ। বহু কষ্টে পর্তুগীজ রণতরী বহরের চোখ এড়িয়ে তিনি সুয়েজে পালাতে সফল হলেও একটি জাহাজ বহরেনের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে ডুবে গেল। অবশিষ্ট দুখানি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন সুয়েজের নৌ-ঘাঁটিতে।

পীরী বে-র এই ব্যর্থতা সুযোগ তৈরী ক'রে দিল তার শত্রুদের। তারা রটালেন, ঘুষ খেয়ে তিনি পর্তুগীজদের ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে এ ভাবে ফিরে এসেছেন। সম্রাট সুলেইমানকেও এই মিথ্যা রটনা দ্বারা প্রভাবিত করতে সফল হলেন তারা। ক্রুদ্ধ সম্রাট প্রাণদণ্ডের সাজা দিলেন বে-কে।

বসরার নৌ-ঘাঁটিতে ঠাঁই নেয়া জাহাজগুলিকে সুয়েজে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন সম্রাট। কিন্তু এ আদেশ কার্যকর করা নিয়ে মহা সমস্যার সৃষ্টি হল। ওই রণতরী বহরের প্রধান কর্মাধীশকে বলা হল সে দায়িত্ব নেয়ার জন্য। তিনি রাজী হলেন

না। এবং বসরা থেকে স্থলপথে যাত্রা ক'রে তিনি মিশরে ফিরে এলেন। রাজধানী কনস্তান্তিনোপল-এ যখন এ খবর পৌঁছাল, বহরের অধ্যক্ষ রূপে নির্বাচিত করা হল কতীফের সঞ্জক-বে মুরাদ বে-কে। তিনি ঐ সময়ে বসরাতেই ছিলেন। তাকে আদেশ করা হল, দুটি বড়, পাঁচটি মাঝারি ও একটি ছোট জাহাজ বসরায় রেখে, বাকি পনেরোটি জাহাজ ও দুটি নৌকা নিয়ে সুয়েজে ফিরে আসতে। মুরাদ বে রওনা হলেন। কিন্তু হরমুজের বিপরীত উপকূলে পর্তুগীজ নৌ-বহরের দ্বারা আক্রান্ত হল তার বহর। বাধল প্রচণ্ড যুদ্ধ। মিশরী নৌবহরের বেশ কিছু লোক মারা গেল, প্রচুর জখম হল, গোলার আঘাতে জাহাজগুলিরও ক্ষতি হলো প্রচুর। একটি নৌকাও দখল ক'রে নিল পর্তুগীজেরা। রাত্রি নেমে আসার দরুন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ থেমে গেল। এবং সেই সুযোগে পালিয়ে গিয়ে আবার বসরায় আশ্রয় নিল জাহাজগুলি।

সম্রাট সুলেইমানের কাছে এ খবর যখন পৌঁছাল তখন হিজরী ৯৬০-এর জিলহিজ মাস শেষ হবার মুখে। সম্রাট পূর্বাঞ্চল অভিযান করতে বেরিয়ে অলেপ্পোয় শীতকালীন ছাউনি ফেলেছেন। এই বইটির মূল নায়ক ও লেখক সীদী আলী রঈসও এ সময়ে তার সঙ্গে। সম্রাট এবার তাকেই মিশরীয় নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ পদে মনোনীত করলেন। দিলেন বসরায় পড়ে থাকা ওই ১৫টি রণতরীকে সুয়েজে ফিরিয়ে আনার গুরু দায়িত্ব।

॥ দুই ॥

মূল তুরস্ক বা তুর্কী দেশটি ইওরোপ ও এসিয়া দুই মহাদেশের ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত। ইওরোপীয় এলাকাকে সেকালে বলা হত রূম। আর এসীয় এলাকাকে অনতোল বা অ্যানাতোলিয়া—অর্থাৎ পূব বা পূবের দেশ। সীদী আলী রঈস ছিলেন রূম বা ইওরোপীয় তুর্কীর অধিবাসী। সেখানকার গলত বা গলতিয়া শহরে তার জন্ম। পিতার নাম হুসেন আলী রঈস। পিতা এবং পিতামহ দুজনেই ছিলেন গলত-এ স্থিত রাজকীয় অস্ত্রাগারের তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ তাদের পরিবার যে পুরুষানুক্রমে শুধু রাজ-কর্মচারীই ছিল তা নয়, ছিল ঐ সাথে তৎকালীন তুর্কীর একটি ক্ষমতাশালী অভিজাত পরিবার। সামরিক বিদ্যা কিংবা রুক্ষ ভাষায়, হত্যা নৈপুণ্যে বংশানুক্রমিক দক্ষতা ছিল তাদের। এবং পিতা-পিতামহের শোণিতধারা থেকে সীদী আলীর শোণিতেও তা ক্রমবিকশিত হয়ে উদ্দামভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। রক্তের এই উদ্দামতাই কিনা কে জানে, সীদী আলীকে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট ক'রে তুলেছিল উদ্দাম সাগরের প্রতি। নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়ে সামরিক বিদ্যার সাথে সাথে জ্যোতির্বিদ্যা, সাগর ও নৌ-বিদ্যায়ও পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। গ্রন্থও লিখেছেন এর প্রত্যেকটি শাখার ওপর। মধ্য-এশিয়ার চগতাই তুর্কী ভাষায়। তবে, প্রকাশক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলে গদ্য শৈলীর চেয়ে পদ্য শৈলীর ওপরই তার দখল ছিল বেশি। ভালো কবিতা লিখতেন। সাহিত্য করতেন 'কিয়াতিবী' ছদ্মনামে। এজন্য কিয়াতিবী রূমী বা তুর্কী লেখক নামেও সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়ে, ইদানিংকাল পর্যন্ত যতগুলি নৌ-অভিযান হয়েছে তার প্রায় সব কটিতেই তিনি অংশ নিয়েছিলেন। এবং

বহু সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে। তার মধ্যে খইরউদ্দীন পাশা, যিনি ইওরোপে 'বরবরোস্সা' নামে সুপরিচিত, এবং সিনাই পাশার মতো নামকরা নৌ-সেনাপতিও রয়েছেন। ভূ-পর্যটনের প্রতিও সীদী আলীর আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। ছিল শেইখ ও সন্তদের সমাধিতে তীর্থ করার দিকেও প্রবল নেশা।

সাগরের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ও রোমাঞ্চ-প্রিয়তার দরুন এই নতুন কর্মদায়িত্ব বেশ খুশী ক'রে তুলল সীদী আলী রঈসকে। মিশরীয় নৌ-বহরের অধ্যক্ষের মতো উঁচু পদ এবং সেই সুবাদে অর্জিত জাগতিক সাফল্য ও মানমর্যাদার গৌরব ও অহমিকা তো আছেই এছাড়া।

হিজরী ৯৬১-র মহরম মাসের পয়লা তারিখ বা খ্রীষ্টাব্দ ১৫৫৩ -র ৭ই ডিসেম্বর তিনি স্থলপথে আলেপ্পো থেকে বসরা যাত্রা করলেন। বীরজিক-এ পৌঁছে পার হলেন ইউফ্রেটেস নদী। এলেন রেকা (আরফা)-য়। তীর্থ ক'রে নিলেন এই সুযোগে আব্রাহামের সমাধিতে। উপস্থিত হলেন নিসবিন। সেখান থেকে তারপর মোসুল। পথে তীর্থ করে নিলেন নবী ইউনুস ও জারিজিসের সমাধিতে। মহম্মদ গোরবিলী, ফতহ মোসুলী, কজীর অলবান মোসুলী প্রভৃতি শেইখের সমাধিও বাদ গেল না। এরপর এগিয়ে চললেন বাগদাদের দিকে। তকরীত পৌঁছে, সোজা সড়ক ধরে না এগিয়ে ইমাম আলী-উল-হাদী ও ইমাম হমন অসকারীর সমাধিতে তীর্থ করার জন্য চলে গেলেন সমির। তারপর আশিক, মাশুক, হরবি ও সমকি-দুর্গ শহর হয়ে পা রাখলেন বাগদাদে।

বাগদাদ পৌঁছে তীর্থ করার নেশায় একটি মাঝারি সফরে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে জিসরের কাছে পার হলেন টাইগ্রিস নদী। করলেন সে অঞ্চলে থাকা সন্ত ও ফকীরদের সমাধি দর্শন। তারপর তেইর দুর্গ, ও বায়ার শহর হয়ে উপস্থিত হলেন ইউফ্রেটেস নদীকূলে। মসির নামের একটি ক্ষুদে শহরের কাছে নদী পার

হয়ে এগিয়ে চললেন। এলেন করবলায়। করলেন শহীদ হসন ও হুসেনের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন। তারপর এলেন শফাত। সেখান থেকে মরু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ চলে পরদিন পৌঁছলেন নজফ। দর্শন করলেন আদম, নোয়া, শিমূন ও আলীর সমাধি। তারপর যাত্রা করলেন কুফা। দর্শন করলেন সেই মসজিদটি যার ধর্মপ্রচার বেদীর নিচে সমাধিস্থ রয়েছেন আলী বংশীয় নবীরা। শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন কম্বর আর তুলতুলের সমাধি মন্দিরেও। গেলেন এরপর হসিনিয়া তুর্গে। দর্শন করলেন আরনের পুত্র, নবী জিলকফলের সমাধি। তারপর হিল্ল শহরে গিয়ে অর্ঘ নিবেদন করলেন ইমাম মহম্মদ মেহদী এবং আলীর ভাই ইমাম অকিলের সমাধিতে। দেখতে গেলেন শমের তৈরি সেখানকার মসজিদটিও। এরপর আবার ইউফ্রটেস নদী পার হলেন। তবে এবার নৌকায় নয়, সেতুর ওপর দিয়ে।

তীর্থ সমাপ্ত করে ফিরে এলেন আবার টাইগ্রিস নদী কূলে বাগদাদ। সেখান থেকে জাহাজে চেপে যাত্রা করলেন বসরায়।

॥ তিন ॥

বসরায় পৌঁছে পরের দিনই সেখানকার তুর্কী নৌ-ঘাঁটির অধিকর্তা মুস্তাফা পাশার সাথে দেখা করলেন সীদী আলী রঈস। মুস্তাফা পাশা তার পরিচয় পত্রাদি পরখ ক'রে নিশ্চিত হবার পর সেই পনেরোটি রণতরীর ভার তাকে বুঝিয়ে দিলেন। সব কটি রণতরীরই অবস্থা তখন বেশ কাহিল। প্রচুর অদল-বদল ও মেরামতির প্রয়োজন। তাই সেগুলিকে যথাসাধ্য সংস্কার ক'রে ব্যবহারযোগ্য ক'রে তোলার দিকে মন দিলেন তিনি। নানাস্থানে লোহার কাঁটা মেরে মেরে সমুদ্র যাত্রা ও শত্রুর আক্রমণের ধকল সইবার মতো মজবুত ক'রে তুললেন। সাজালেন তাকে কামান ও বন্দুক দিয়ে। কিন্তু এ জন্য যতো কামান ও বন্দুকের প্রয়োজন তা পাওয়া গেল না। না বসরার অস্ত্রাগারে না হরমুজ থেকে। তাই যতোটা যা পেলেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাকে। করতে হল রণতরীগুলিতে পানীয় জল মজুদ ও সরবরাহের সুবন্দোবস্ত-ও।

হাতে এবার প্রচুর অবসর। সমুদ্র যাত্রা তো আর যখন তখন করা চলে না। সেজন্য চাই উপযুক্ত জলবায়ুর পরিবেশ—অনুকূল মৌসুম। সে মৌসুম আসতে এখনো পাঁচ মাসের মতো দেরি। তাই বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে দেখে সময় কাটাতে থাকলেন। গেলেন আলী নির্মিত মসজিদটি দেখতে। দেখে এলেন হসন বসরী, তলহ, জোবেইর, য়ুনস-বিন-মালিক, অবদুর-রহমান বিন অন্‌ফ প্রভৃতি ইসলাম ধর্ম প্রবর্তকের কতক সহচর ও ধর্মীয় শহীদদের সমাধি-কুঞ্জ।

হঠাৎ একদিন রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন সীদী আলী

রঈস। তিনি তার তরবারিটি হারিয়ে ফেলেছেন। কিছুতেই আর খুঁজে পাচ্ছেন না সেটিকে। ঘুম ভাঙতে এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে করতে তার মনে পড়ে গেল শেইখ মহী-উদ-দীনও ঠিক এরকম এক স্বপ্ন দেখেছিলেন। ফলে যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছিল তার।

সীদী আলী রঈস সে যুগের মানুষ, যে যুগের প্রায় প্রতিটি লোক-ই ছিল ভাগ্য আর কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তা যতো শিক্ষিত কিংবা বীর পুরুষ হোন না কেন তিনি। অথবা হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলিম কিংবা অন্য যে কোন ধর্মে বিশ্বাসী-ই হোন না কেন এবং নিজেকে বা নিজের জাতিকে অন্যদের থেকে যতোই অগ্রসর বলে মনে করুন না কেন। আর, না হয়েই বা উপায় কি? নিজেদের আচার-আচরণ দিয়ে তারা পৃথিবীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এমন নোংরা ও জটিল ক'রে তুলেছিলেন যে নিরাপত্তা বলে কোন বস্তুই পৃথিবীতে ছিল না। এখনও কি আছে? সুতরাং ভাগ্যবাদী আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হয়েই বা উপায় কি? তাই বীর ও সাহসী সীদী আলী রঈসের মনকেও এ স্বপ্ন বেশ নাড়া দিল। পরিকল্পিত অভিযানে অগৌরব অর্জনের আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু হয়ে উঠল। ইসলামের অস্ত্র-ক্ষমতা যাতে বিশ্ববিজয়ী হতে পারে সেজন্য ঈশ্বরের কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানালেন তিনি। স্বপ্নের কথাও অন্যদের কাছ থেকে গোপন রাখলেন। আর, হয়তো গোপন রাখতে গিয়েই, কিছুতেই সে স্বপ্নের কথা তিনি ভুলতে পারলেন না। থেকে থেকে দিনের পর দিন তা তার মনের মধ্যে খোঁচা মেরে চলল।

কিছু দিনের মধ্যেই মুস্তাফা পাশা এক সামরিক অভিযানের আয়োজন করলেন। উদ্দেশ্য হুওয়েইজা দ্বীপ দখল। সীদী আলী রঈসকেও এতে অংশ নিতে বলা হল। পাঁচখানি রণতরী নিয়ে যোগ দিলেন তিনি। কিন্তু, খুব সহজেই দ্বীপটিকে জয় করা যাবে

এরকম 'হালকা মনোভাব নিয়ে তুর্কী নৌ-বাহিনী যুদ্ধ করার দরুন' শুধু যে এ অভিযান ব্যর্থ হল তা-ই নয়, বাহিনীর প্রায় শত-খানেক সেনাকেও জীবন হারাতে হল।

সীদী আলী রঈস ভাবলেন : যাক্, বাঁচা গেল। স্বপ্নে মেলা অমঙ্গল-সূচনা এভাবেই কেটে গেল শেষপর্যন্ত। মনের ভার নেমে যাওয়ায় বেশ তাজা ও প্রফুল্ল বোধ করলেন তিনি। ভুলে গেলেন :

ঘটার যা ঘটবেই যখন তা নিয়তিতে লেখা
চাও বা না চাও তুমি সে তার সময়ে দেবে দেখা।

এসে গেল জাহাজ চলাচলের মৌসুম। মুস্তাফা পাশার নির্দেশে একজন বিশ্বস্ত নাবিক একটি ছোট রণতরী নিয়ে চলে গেলেন হরমুজ। সেখানকার ও তার আশেপাশের হালচাল সম্পর্কে, পর্তুগীজদের অবস্থান সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য। প্রায় মাস খানেকের মতো সাগরে টহল দিয়ে ফিরে এল সে। জানাল : সাগর বুকে খান চারেকের বেশি জাহাজ নেই এখন। কাফের পর্তুগীজদের কোন জাহাজের চিহ্নবর্ণও নেই এ সাগর-এলাকায়।

অতএব নিশ্চিন্ত মনে সৈন্যদের জাহাজে চড়ার আদেশ দেয়া হল। যাত্রা করলেন সীদী আলী রঈস সেই ১৫টি রণতরীর বহর নিয়ে মিশর ফেরার জন্য।

যেতে হবে তাকে পারস্য উপসাগর, ওমান উপসাগর, আরব সাগর ও লোহিত সাগরের পথ ধরে।

॥ চার ॥

যে-দিনটিতে বসরা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করলেন সীদী আলী রঈস সে-দিনটি শওয়াল মাসের পয়লা তারিখ। হরমুজ পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য মুস্তাফা পাশার একটি ফ্রিগেট বা ছোট রণতরী তার বহরের সঙ্গী হল। এ রণতরীটির অধিনায়ক ছিলেন শেরিফ পাশা।

সীদী আলী রঈসের শুধু যে সাগর দেখার নেশা, তা নয়। রয়েছে সেই সাথে স্থল-পর্যটনের নেশাও। বিশেষ ক'রে মুসলমান সন্ত ও ফকীরদের সমাধি-কুঞ্জ দর্শন। অতএব পথে ঘন ঘন থামলেন তিনি। মহজরী-তে নেমে দর্শন করলেন খিদরের সমাধি। দিজ-ফুল ও চরিকের শুশতর উপকূল পার হবার বেলা ক'রে নিলেন ইমাম মহম্মদ, হানিফ ও অন্যান্য সন্ত ও মহাপুরুষদের সমাধিতে তীর্থ। শীরাজ প্রদেশে পৌঁছে থামলেন সেখানকার বন্দরে। সম্ভবতঃ বুশহর-এ। ক'রে এলেন রীশহর শহর পর্যটন।

ছোট জলযান পাঠিয়ে চারিদিকে সন্ধান নেবার পরও যখন পর্তুগীজ জাহাজের দর্শন পাওয়া গেল না, তখন কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে বাম উপকূল ত্যাগ ক'রে ডান উপকূলের দিকে এগিয়ে চললেন তিনি। লক্ষ্যস্থল আরব উপকূলের লহস দ্বীপের নিকটবর্তী কতীফ এবং তারপর হজর।

হরমুজ বহরেন এবং ফলহত-এর মতো পারস্য উপসাগরের লহস দ্বীপটিও পারস্য-ভারত বাণিজ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে সে-কালের একটি প্রধান শহর ও বন্দর।

কতীফ এবং হজরেও যখন শত্রুপক্ষীয় জাহাজের অবস্থান সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না তখন আপন বহর-কে বহরেন এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন সীদী আলী রঈস। পৌঁছে

দেখা করলেন সেখানকার সামরিক অধিনায়ক রঈস মুরাদের সঙ্গে।

কিন্তু তিনিও পর্তুগীজ বহরের গতিবিধি সম্পর্কে কোনরকম শুলুক-সন্ধান দিতে পারলেন না।

বহরেনে চলিত একটি কৌতূহলকর প্রথা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল সীদী আলী রঈসকে। লক্ষ্য করলেন, এখানকার নাবিকেরা চামড়ার থলি বা ভিস্তি নিয়ে সাগরে ডুব দিয়ে তার তল থেকে পরিস্রুত জল তুলে নিয়ে আসে। রঈস মুরাদ এই জলই ব্যবহার ক'রে থাকেন। বসন্তকালে এই জল খেতে যেমন ঠাণ্ডা তেমনি মনোরম। ব্যবহারের জন্য তাকেও এই জল কিছুটা সরবরাহ করলেন রঈস মুরাদ।

সাগর-জলও এমন স্বাদু! ঈশ্বরের ক্ষমতা-বৈচিত্র্যের এই নিদর্শনে মোহিত হয়ে গেলেন তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী সীদী আলী রঈস।

"এই জল ব্যবহারের প্রথা থেকেই সেখানে জন্ম নিয়েছে 'মরাজ-উল বহরেইন জল্লকিয়ান' প্রবাদ বাক্যটির। তা থেকেই এ বন্দরটির বহরেইন বা বহরেন নাম।"

ক্রমশঃ এগিয়ে নৌবহর এবার সবুজ সাগরের বুকে পৌঁছাল। সবুজ সাগর হরমুজ প্রণালীর অন্য নাম। প্রথমে ভিড়ল বহর কিয়া বা পুরানো হরমুজে। তারপর বরহতায়। তারপর আরো কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপে। কিন্তু কোনখান থেকেই কোন হদিস পাওয়া গেল না শত্রুপক্ষীয় বহরের। অতএব, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে মুস্তাফা পাশা যে রণতরীটিকে তাদের সঙ্গী রূপে দিয়েছিলেন সেটিকে বিদায় দিলেন সীদী আলী রঈস। তরীটির অধিনায়ক শরীফ পাশাকে বললেনঃ অধ্যক্ষ মুস্তাফা পাশাকে বলবেন আমরা নিরাপদেই হরমুজ পার হয়েছি।

জিলগর ও জদি-র উপকূল ধরে এগিয়ে চলল নৌবহর। পার হল কেমজর ও লিমি শহর। কেটে গেছে যাত্রার পর:

একে একে চল্লিশটি দিন। শওয়াল মাস পার হয়ে রমজান মাসের ১০ তারিখ সেদিন। আচমকা সেদিন সকালে দৃষ্টির দিগন্তে আবির্ভাব ঘটল শত্রুপক্ষীয় জাহাজের। একটি দুটি নয়। পঁচিশ খানি। চারটি বড়ো জাহাজ, তিনটি গ্যালিয়ন বা স্প্যানিশ জাহাজ, ৬টি পর্তুগীজ প্রহরা জাহাজ; বারোটি কলিতা বা গ্যালি জাতীয় নিচু ও দীর্ঘ এক পাটাতন বিশিষ্ট জাহাজ।

দেখেই সীদী আলী রঈস রোদ আড়াল করার চাঁদোয়া ও পর্দাগুলি সরিয়ে নেয়ার ও নোঙর ফেলার নির্দেশ দিলেন। সৈন্যদের হুকুম দিলেন কামান ও বন্দুক নিয়ে একেবারে প্রস্তুত অবস্থায় থাকতে। লটকানো হল মূল-মাস্তুল শীর্ষে রাষ্ট্রের প্রতীক। ওড়ানো হল জাতীয় পতাকা।

শত্রুপক্ষের জাহাজ কামানের পাল্লার সীমানা মধ্যে আসতেই আল্লার নামে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি তুলে শুরু করা হল আত্মরক্ষার্থে গোলাবর্ষণ।

প্রতিপক্ষও চুপ ক'রে রইল না। চলল উভয় দিক থেকেই বন্দুক ও কামানের একটানা প্রচণ্ড গোলা-গুলি বর্ষণ। কাফের পর্তুগীজদের একটি গ্যালিয়নকে বিধ্বস্ত ক'রে ডুবিয়ে দিল সীদী আলী রঈসের বাহিনী।

"(নৌ-) যুদ্ধের ইতিহাসে এরূপ প্রচণ্ড লড়াই ইতিপূর্বে কখনো আর হয়নি। এর বর্ণনা দেয়ার মতো ক্ষমতা ভাষার নেই।"

"সূর্য পশ্চিম দিগন্তে লীন হওয়া পর্যন্ত চলল এ যুদ্ধ। তাতেও সীদী আলী রঈসের নৌ-বাহিনীকে কাবু করতে না পেরে 'কাফের' নৌ-বহরের নায়ক বিচলিত হয়ে পড়লেন। সংকেত জ্ঞাপক কামানকে এবার পশ্চাৎ অপসরণের নির্দেশ সূচক তোপধ্বনি করতে বললেন। রণে ভঙ্গ দিয়ে তারপর তারা একে একে হরমুজের দিকে অদৃশ্য হল।"

"ঈশ্বরের করুণায় এবং পাদশাহের শুভ গ্রহের কল্যাণে

ইসলামের শত্রুদের পরাজয় স্বীকার ক'রে নিতে হল। রাত্রির অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম আমরা। এরপর যখন বাতাস বইতে শুরু করল, পাল তুলে দিলাম। কাছেই উপকূল। সুতরাং ভোর না হওয়া পর্যন্ত (তারই গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম)।"

পরের দিনটিও তারা পূর্ব পরিকল্পনা মতো চলতে থাকলেন ওমান উপসাগর কূল ধরে মিশরের দিকে। তার পরদিন, অর্থাৎ বারো তারিখে পৌঁছলেন এসে খোরফকনে। ওমানের পূব উপকূলে রস দিব্ব ও ফেজনা-র মাঝে অবস্থিত এ বন্দর-শহরটি। জাহাজগুলিতে পানীয় জল নিয়ে নিলেন এখান থেকে। তারপর করলেন আবার যাত্রা শুরু। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পৌঁছলেন এসে ওমানে, কিংবা আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে সহর-এ। এ বন্দরটিও ওমানের পূব উপকূলেই। এ ভাবে পুরো সতেরো দিন নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলল অটোমান সাম্রাজ্যের মিশরীয় নৌ-বহর। এলো ৬ই রমজানের প্রভাত। রমজান মাসের এক বিশেষ পর্বের রাত, কদর-ঘজেসির দিন সেটি। মসকাত ও কলহত-এর প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে নৌ-বহর। সীদী আলী রঈস ও নৌ-বহরের অন্যান্য নাবিক ও সেনারা দেখতে পেলেন, ১২টি বড় নৌকা ও ২০টি গুরাব, সবসুদ্ধ ৩২টি জলযানের এক বহর মসকাত বন্দর থেকে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। এদের অধিনায়কত্ব করছিলেন (সম্ভবতঃ গোয়ার পর্তুগীজ) শাসনকর্তার পুত্র ক্যাপটেন কুওয়া। সঙ্গে তাদের প্রচুর সৈন্য।

বড় নৌকাগুলি পর্তুগীজ ধরনের। ছোট বা গুরাবগুলি স্প্যানিশ গ্যালিয়ন গোত্রীয়। ছোট-বড় সবগুলি পাল খাটিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে তারা। দেখা যাচ্ছে প্রহরা-নৌকা-গুলির গোলাকার পাল-গুলিও। এত পাল যে তাকে অতিক্রম ক'রে পিছনের আর কিছুই চোখে পড়ছে না।

দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই সীদী আলী রঈসের অটোমান মিশরীয় নৌ-বহরকে আক্রমণ করল তারা। ‘আমরা ঈশ্বরের রক্ষা-ছত্রের নিচে রয়েছি এই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে’ সীদী আলী রঈসের নৌ-বাহিনীও বীর বিক্রমে প্রতিরোধ ক’রে চলল তাদের। গর্জে আগুন উদ্গার ক’রে চলল দু-পক্ষের কামান আর বন্দুক। চলল দু-দিককার তীরন্দাজদের ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ। বর্শাও বাদ গেল না। এমন কি শুরু হল শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট নৌকায় চেপে তরবারি নিয়ে মুখোমুখি লড়াই।

“আমাদের ছোঁড়া ‘বজল উসক’ (?) ওদের নৌকা ও শইকা (বজরা বা গ্যালিয়ন)-গুলি ভেদ করলো, তাদের হালগুলিতে বড় বড় গর্ত করে ফেলল। অন্যদিকে শত্রুপক্ষের জাহাজগুলির ওপর থেকে ছোঁড়া বর্শায় আমাদের জাহাজগুলিরও গা শরবনের চেহারা ধারণ করল।

“এ ছাড়া (পাথর ছোঁড়া কামানের সাহায্যে) আমাদের দিকে এত পাথর বৃষ্টি ক’রে চলছিল ওরা যে সেগুলি সাগরজলে প’ড়ে রীতিমতো আবর্ত সৃষ্টি ক’রে চলছিল।

“ওদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে আমাদের একটি রণতরীতে আগুন ধরে গেল। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ওদের যে নৌকা থেকে সেটি ছোঁড়া হয়েছিল আগুন ধরল সেটিতেও। ঈশ্বর কি মহিমময় !

“যুদ্ধে আমাদের পাঁচখানা রণতরী ডুবল। ওদেরও ঠিক পাঁচখানা তরী ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত সাগর জলে ঠাঁই নিল। একখানি তো পুরো সব কটি পাল খাটানো অবস্থাতেই।”

এক কথায় বলতে গেলে দু-পক্ষেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল এ যুদ্ধে। ফলে সীদী আলী রঈসের বহরে দাঁড় টানার লোকের ঘাটতি দেখা দিল। এই ঘাটতি আরো উগ্র হয়ে উঠল একদিকে

কামান দেগে চলা, অন্যদিকে স্রোতের বিপরীতে রণতরী-গুলিকে এগিয়ে চলতে বাধ্য হবার দরুন। অনন্যোপায় হয়ে নোঙরগুলিকে জলে নামিয়ে দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি। ছোট নৌকায় চেপে যে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এতক্ষণ, তাও বর্জন করা হল।

ডুবে যাওয়া রণতরীগুলির অধিনায়কদের মধ্যে আলমশাহ রঈস, কর মুস্তাফা ও কলফত মেমী স্বেচ্ছাসেবী দলের সর্দার ডেরজী মুস্তাফাকে, অবশিষ্ট সেনাদের ও ২০০ জনের মতো ছুতার (ও দাঁড়ি-মাল্লা ?) দের সাথে নিয়ে আরব উপকূলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। দাঁড়ি-মাল্লারা সকলেই আরব। সুতরাং নেজদ-এর আরবরা তাদের সকলের প্রতি আতিথেয়তা দেখাতে কোনরূপ কার্পণ্য করল না।

কাফের শত্রুপক্ষের ডুবে যাওয়া গুরাব বা জাহাজগুলির নাবিক ও অন্যান্য লোকজনদেরও অন্য জাহাজগুলি উদ্ধার ক'রে উপকূলে নামিয়ে দিল। তাদের মধ্যেও আরবরা থাকার দরুন তাদেরও সেখানে আশ্রয় ও আথিতেয়তা লাভ করতে কোন অসুবিধা হল না।

"ঈশ্বর সাক্ষী। (সেনানায়ক) খইরউদ্দীন পাশা ও এণ্ড্রুস ডোরিয়ার মধ্যে যে নৌ-যুদ্ধ হয়েছিল তাও বর্তমান যুদ্ধের মতো এত তীব্র নয়।"

অবশিষ্ট ধ্বস্ত রণতরীগুলি নিয়ে শত্রু কণ্টকিত পথ ধরে মিশর পানে এগিয়ে চলা আর নিরাপদ মনে করলেন না সীদী আলী রঈস। বহরের মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এগিয়ে চললেন হরমুজ প্রণালীর দিকেই আবার। এদিকে রাতের অন্ধকারও ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল। বইতে সুরু করল বাতাসও। তরীগুলির বড় নোঙর জোড়া আগেই সাগরজলে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। ছোট নৌকা (লুহস্ত)-গুলিকেও ভালো ক'রে দেয়া হয়েছিল তার সঙ্গে বেঁধে।

বিজিত গুরাব-গুলিকে টানতে টানতে এগিয়ে চলল তারা। রণতরীগুলিও জলে নামান নোঙরসহ তার পিছু পিছু এগিয়ে চলল।

তীরে ভেড়ার প্রয়াস করলেন সীদী আলী রঈস। কিন্তু সেজন্য অনুমতি দেয়া হল না তাকে। বাধ্য হয়েই সমুদ্রে ভেসে চললেন তিনি। আরব উপকূল ত্যাগ ক'রে অবাধ সাগর বুকে সারারাত সাঁতার কেটে চলল তার রণ-তরীর বহর।

এলেন সাগর সাঁতরে বাম থেকে শেষ পর্যন্ত ডান উপকূলে। পৌঁছলেন করমান প্রদেশের জশ বন্দর-বেলায় (জস্ক)। এ বন্দরটি বেলুচিস্তানের নিকটবর্তী পারস্য তটরেখায়। 'বেশ দীর্ঘ উপকূল। খুঁজে খুঁজে কোথায় যে বন্দর-ঘাট তার হদিস মিলল না'। সুতরাং দু'দিন ধরে সাগরের বুকে এলোমেলো টহল দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছালেন এসে 'কিচি-মকরান'-এ (মারকো পোলো কথিত কেশ-মকরান)।

যখন বন্দরের হদিস পেলেন তার অনেক আগেই সন্ধ্যা নেমে গেছে। তাই তখুনি আর ভেড়া সম্ভব হল না ঘাটে। সে রাতটিও সাগরের বুকেই কাটিয়ে দিতে হলো।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই বইতে শুরু করল প্রবল বাতাস। দুরন্ত তার গতিবেগ। এত দুরন্ত যে বেশ কিছু নাবিককে উড়িয়ে নিয়ে গেল। বাকিরা কোনমতে আত্মরক্ষা ক'রে অশেষ বাধা-বিপত্তি-ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে জাহাজগুলিকে শেব বন্দরে ভেড়ালেন (সম্ভবতঃ আধুনিক শবর)।

একটি দস্যু জাহাজও বন্দরটিতে ঠাঁই নিয়েছিল এ সময়ে। পুরো জাহাজটি লুটের মালে বোঝাই। কিন্তু সীদী আলী রঈসের দুর্ভাগ্যগ্রস্ত বহরের নাবিকদের প্রতি তারা বেশ সহানুভূতিই দেখাল। তাদের মতো তারা নিজেরাও যে মুসলমান এ কথা ব্যক্ত ক'রে তাদের সঙ্গে হার্দিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

দস্যু জাহাজের অধিনায়ক তাদের জাহাজে বেড়াতে এলেন। এক ফোঁটাও খাবার জল ছিল না তখন জাহাজগুলিতে। জল সরবরাহ ক'রে অবসন্ন তৃষ্ণার্ত নাবিক ও সৈনিকদের প্রাণে নতুন জীবনের সঞ্চার করলেন তিনি।

দিনটি ছিল বৈরামের দিন। অর্থাৎ শুক্রবার, মুসলমানদের বিশেষ প্রার্থনা ও উৎসবের দিন। তাই জল খেতে পেয়ে দিনটি এবার দ্বিগুণ উৎসবের দিনে পরিণত হল।

এই দস্যু জাহাজটিই প্রহরী রূপে তাদের পথ দেখিয়ে দেখিয়ে পৌঁছে দিল গোয়াদরে।

এটি বেলুচিস্তানের সাগর উপকূলস্থ একটি বন্দর।

"অধিবাসীরা সকলেই বালুচ। তাদের শাসক হলেন মালিক দিনারের পুত্র মালিক জলালউদ্দীন। গোয়াদরের শাসনকর্তা আমাদের জাহাজগুলি পরিদর্শন করতে এলেন। আমাদের সুমহান পাদিশাহের প্রতি তার আন্তরিক অনুরক্তির কথা জানিয়ে আশ্বস্ত করলেন। কথা দিলেন, ভবিষ্যতে আমাদের কোন বহর হরমুজ (উপসাগরে) এলে ৫০।৬০ খানা নৌকায় ক'রে তাদের সব রকম প্রয়োজনীয় সামগ্রী যুগিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। সব রকম ভাবে করা হবে আমাদের সেবা ও সাহায্য।"

"তখন স্থানীয় রাজা জলালউদ্দীনের কাছে একজন দিশারী চেয়ে পত্র দিলাম। প্রথম শ্রেণীর একজন দিশারী পাঠিয়ে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দিলেন যে প্রেরিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, আমাদের পাদিশাহের সেবার ক্ষেত্রে এতটুকুও নিষ্ঠার অভাব হবে না তার।"

॥ পাঁচ ॥

অনুকূল আবহাওয়া দেখে আবার তরী ভাসালেন সীদী আলী রঈস। মিশর পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে সংকল্প করলেন আপাততঃ ইয়েমেন যাবার। ইয়েমেন আরব ভূখণ্ডের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে লোহিত সাগর উপকূলে।

গোয়াদর ছেড়ে এগিয়ে চলল তার বহর। উপস্থিত হল জফর (বা ধফর)-এর প্রায় বিপরীত দিকে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে দেখা দিল নাবিকদের কাছে 'ফিল তুফানী' নামে পরিচিত ভয়ংকর ঝড়-তুফান। এর ফলে উল্টো দিকে ভেসে চলতে বাধ্য হলেন তারা। পাল খাটাবার, এমনকি ঝড়ের পাল খাটাবার সুযোগটিও পেলেন না। আর ঝড়ের উদ্দামতা ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে চলল। 'এই ঝড়-তুফানের ভয়ংকরতার কাছে পশ্চিম সাগরের যে কোন দুর্যোগ নিতান্তই ছেলে-খেলা ছাড়া আর কিছু না। ঐ সময়ে পশ্চিম সাগরে যে বিশাল তরঙ্গ মালা দেখা দেয় তা ভারত মহাসাগরীয় তরঙ্গ মালার কাছে নেহাৎই জলবিন্দুটি।' দিন রাত সম্পূর্ণ একাকার হয়ে গেল। জাহাজগুলিকে স্থির রাখার জন্য যে সব ভারি সামগ্রী তাতে চাপানো হয়েছিল তরঙ্গ ও বাতাসের দাপটে সেগুলি উৎক্ষিপ্ত হয়ে সাগর গর্ভে গিয়ে ঠাঁই নিলো। 'এই বুক হিম ক'রে দেয়া দুর্যোগে আমাদের একমাত্র ভরসা বলতে তখন অসীম ক্ষমতাবান ঈশ্বরের প্রতি অটুট বিশ্বাস।' দশদিন ধরে চলল অবিরাম ঝড়-তুফানের এই উন্মত্ততা। হয়ে চলল সেই সাথে মুষলধারায় বর্ষণ। ক্ষণিকের জন্যও সূর্যের মুখ কিংবা নির্মল আকাশ দেখার সৌভাগ্য হলনা এ ক'দিনের ভেতর।'

সঙ্গীদের মনোবল যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্য যথাসাধ্য প্রয়াস ক'রে চললেন সীদী আলী রঈস। উপদেশ দিয়ে চললেন, যা কিছুই ঘটুক না কেন সাহস বজায় রেখে বীরের মতো তার মুখোমুখি হতে, এই বিশ্বাসে অবিচল থাকতে যে বিপদ কেটে গিয়ে সুদিন আসবেই। এক সময়ে শুভ পরিবর্তনের সংকেত পাওয়া গেল। দেখা দিল বিরাট এক মাছ (তিমি?)। প্রায় দুই জাহাজের মতো লম্বা। কিংবা তার চেয়েও বড় হবে হয়ত। দেখে দিশারী বললেন : এ এক শুভ লক্ষণ।

সাগরের যে এলাকা দিয়ে এখন তারা ভেসে চলেছেন এখানে ভাঁটার গতি অতি মন্থর হলেও জোয়ারের গতি বেশ তীব্র। নাবিকদের কাছে জাজ উপসাগর রূপে পরিচিত এ এলাকাটি। চলতে চলতে বহুরকম বিশালকায় জলজ প্রাণী দর্শনের সৌভাগ্য হল নাবিকদের। সিন্ধুঘোটক, অতিকায় সামুদ্রিক সাপ, অগুণতি বিরাট বিরাট কচ্ছপ, আর বান মাছ।

জলের রঙ হঠাৎ একসময়ে পালটে গিয়ে ঝিকিমিকি সাদা হয়ে গেল। তা দেখেই দিশারী চমকে উঠে আর্ত চীৎকার তুললেন : সাবধান, সাবধান! ঘূর্ণী স্রোত আর ঘূর্ণী বাত্যা এল বলে।

"এ সব এ অঞ্চলে নতুন কিংবা আজব কথা কিছু নয়। আবিসিনিয়ার উপকূলে এবং জাজ উপসাগরের সিন্ধুর নিকটবর্তী এলাকাতেই শুধু যা এ ধরনের ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়ে থাকে। এ অঞ্চলে এসে এর প্রকোপে পড়েনি এমন সৌভাগ্য খুব কম জাহাজের হয়েছে। অন্ততঃ নৌবিদ্যা বিষয়ক পুঁথিতে এই রকমটিই পড়েছি আমরা। অতএব সতর্ক হয়ে ঘন ঘন জলের গভীরতা মেপে চললাম। যখুনি দেখলাম গভীরতা মাত্র পাঁচ কুলজ (বা পাঁচ হাত) তাড়াতাড়ি প্রতিটি তরীর তিনটি মাস্তুল মধ্যে একেবারে পেছনেরটিতে পাল খাটিয়ে দিলাম। পালের দণ্ডটিকে হিসাব কষে প্রয়োজন মতো বাঁদিকে হেলিয়ে

দেয়া হল। ওড়ানো হলো অধিনায়কের পতাকা। তারপর ঘূর্ণীর টানে বিতাড়িতের মতো এলোমেলো ভাবে ভেসে চলতে থাকলাম। কাটল এভাবে পুরো একটি দিন একটি রাত। এরপর ঈশ্বরের কৃপায় জল ক্রমাগত বাড়তে থাকল, ঘূর্ণী ঝড়ের প্রকোপও হয়ে এল স্তিমিত। জাহাজগুলিকে এবার ঠিকভাবে সঠিক পথে চালানো সম্ভব হল।"

পরদিন সকালে পালের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে জাহাজগুলিকে ধীর গতিতে চালাবার নির্দেশ দিলেন সীদী আলী রঈস। কোথায় এসে পড়েছেন তা স্থির করার জন্য স্নুরু করলেন চারিদিক পর্যবেক্ষণ। চোখে পড়ল একটি দেবমন্দির। জানা গেল, (গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চলের) জমহের (জামনগর ?) এলাকার উপকূলভাগে এসে পড়েছেন তারা। পালের সংখ্যা আরো কমিয়ে জাহাজের গতি আরো ধীর করে দেয়া হলো। পার হলেন একে একে ফরমাইয়ন (মিয়ানি ?) ও মঙ্গলির (মঙ্গরোল)। এগিয়ে চললেন তারপর সোমনাথের দিকে। পার হলেন সে শহর ও বন্দরটিও। এলেন দিউ। কিন্তু কাফের. অর্থাৎ পর্তুগীজদের ভয়ে সেখানে ভিড়লেন না তারা। এগিয়ে চললেন সরদরমা-র (?) দিকে।

কিন্তু কপাল মন্দ। আবার ঝড় উঠল সাগরে। এত প্রবল যে জাহাজের হাল নিয়ন্ত্রণ করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল মাল্লাদের পক্ষে। অনন্যোপায় হয়ে, হালের লম্বা হাতলের সঙ্গে দু ভাঁজ ক'রে লম্বা কাছি বেঁধে দেয়া হল। কাছির এক এক প্রান্ত চারজন ক'রে নাবিক ধরে রইল। এভাবে বহু কষ্টে তারা হালকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চললো।

প্রবল দোলায় হাঁটা চলা তো দূর কথা ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকাও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বাতাসের গর্জন আর জাহাজের বিভিন্ন অংশের কাঠের ঠকঠকানি শব্দে নিজের কথা পর্যন্ত নিজে শুনতে পাচ্ছে না কেউ। সুতরাং আকারে ইঙ্গিতে নির্দেশ দেয়া

চলতে থাকল নাবিকদের। আর, কি অধিনায়ক, কি সাধারণ নাবিক কেউ যে তার স্থান ত্যাগ ক'রে মুহূর্তের জন্য একটু অবসর নেবে সে উপায়ও রইল না। বারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ গুদাম ঘরে যথেষ্ট নিরাপদে রাখা হয়েছিল বলে সে জন্য বিশেষ কোন উদ্বেগের কারণ ছিল না। শুধু জাহাজগুলি যাতে রক্ষা পায়, তারই জন্য মরিয়া হয়ে প্রয়াস ক'রে চলল সকলে, উত্তাল তরঙ্গের বুক চিরে এগিয়ে যেতে থাকল সাবধানে।

'সত্যিই কি নিদারুণ ভয়ংকর দিন!' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুর্যোগ কাটিয়ে উঠলাম আমরা। পৌঁছলাম এসে ভারতের গুজরাটে।'

অর্থাৎ কাথিয়াবাড় ও কাম্বে উপসাগর পার হয়ে গুজরাটের সুরাট অঞ্চলের কাছে।

তবে গুজরাটের ঠিক কোন্ এলাকায় এসে পড়েছেন তা তখুনি স্থির করতে পারলেন না তারা। এমন সময় দিশারী হঠাৎ আবার চীৎকার তুললেন: সাবধান, সামনেই খাড়ির ঘূর্ণীস্রোত। সঙ্গে সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নোঙর নামিয়ে দেয়া হল। কিন্তু তবুও সামাল দেয়া গেল না। ঘূর্ণীজলের প্রবল তোড় সীদী আলী রঈসের জাহাজটিকে এমন বেগে পিছন দিকে ঠেলে দিল যে প্রায় ডুবে যাওয়ার উপক্রম। দাঁড়ীরা আতঙ্কে চীৎকার তুলে আসন ছেড়ে উঠে পড়ল যে যার। অন্যান্য নাবিকরাও ভয়ে দিশেহারা হয়ে দেহের পোশাক-আশাক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেউ বা কাঠের পিপে, কেউ বা মাস্তুল কিংবা ভারি কাঠ জাপটে ধরলে। উচ্চস্বরে পরস্পারের কাছ থেকে বিদায় নিলে। জাহাজ নিশ্চিত ডুবতে চলেছে ভেবে পোশাক-আশাক খুলে ফেললেন সীদী আলী রঈসও। ঈশ্বরের কাছে জীবন রক্ষার আকুতি জানিয়ে আপন ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘোষণা করলেন, নিলেন মক্কার ভিখারিদের ১০০ ফ্লোরিন (স্বর্ণমুদ্রা) দান করার মানত।

চার চারটি নোঙর ছিঁড়ে লোপাট হয়ে গেল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল জাহাজটি। পরমুহূর্তেই ফাটলটি পার হয়ে অন্যদিকে চলে গেল। রক্ষা পেয়ে গেল জাহাজ। দিশারী জানালেন, যদি দিউ ও দমনের মাঝে অবস্থিত এই ফিশ্‌ত-কিদম্মুর-এ জাহাজ ডুবে যেত তাহলে কিছুতেই প্রাণ রক্ষা করতে পারতেন না আপনারা।

যাই হোক, আবার পাল খাটানো হল জাহাজে। সিদ্ধান্ত নেয়া হল, কাফের, অর্থাৎ পর্তুগীজদের উপকূল এলাকাতেই যাবেন তারা। কিন্তু জোয়ার-ভাঁটার বৈশিষ্ট্য ও স্রোতের গতিবেগ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে সীদী আলী রঈস সিদ্ধান্তে এলেন যে মূল ভূভাগ থেকে এখন তারা খুব বেশি দূরে নন। তাই পরিকল্পনা পাল্টাবেন কিনা তা ভাবতে বসলেন। শেষে, দৈব নির্দেশ কি তা জানার জন্য কোরানের পাতা ওল্টালেন। পেলেন, ধৈর্য ধরার নির্দেশ। তাই আর কূলে ভেড়ার প্রয়াস না ক'রে তারা মনযোগী হলেন জাহাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণের দিকে। তা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, জাহাজের খোলে প্রচুর জল ঢুকে গেছে, গুদামঘরগুলির প্রায় ডুবু ডুবু অবস্থা। ত্রস্ত হয়ে সেই জল নিকাশের দিকে মনযোগী হলেন তারা। প্রায় সকলে লেগে গেলেন সে কাজে। খোলের গায়ে গুটি দুই জায়গায় ছেঁদা করেও দেয়া হল জল দ্রুত বার ক'রে দেয়ার জন্য।

বিকালের কাছাকাছি আবহাওয়া কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল, মেঘ কেটে উঁকি দিল নীল আকাশের মুখ। চারিদিক নিরীক্ষণ ক'রে জানতে পারা গেল জাহাজটি গুজরাটের পর্তুগীজ বন্দর দমন থেকে খুব বেশি দূরে নয়। দু মাইল কিংবা আরেকটু বেশি হবে হয়ত।

অন্য জাহাজ কটিও এসে পড়ল ইতিমধ্যে। তবে সব কটিই নয়। খবর পাওয়া গেল, বাকিগুলি খোলের ভেতর জল ঢুকে যাবার দরুন কূলের কাছাকাছি এলাকাতেই অচল হয়ে পড়ে আছে। তার

দাঁড়, ছোট নৌকা, পিপা এবং অন্যান্য ভাঙা অংশ সাগর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। দ্রুত বেড়ে চলা জোয়ারের তোড়ে সেগুলি গিয়ে কূলে ঠাঁই নিয়েছে।

আবহাওয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার প্রতিকূল চেহারা নিল। আসলে ভারতবর্ষে এ সময়টা জাহাজ চলাচলের মৌসুম নয়। বাদলের ঋতু। ভরা কটাল আর একটানা মুষল ধারা বর্ষায় কূলের দিকে জাহাজ ভেড়ানোই সম্ভব হল না। ভাগ্যের ওপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একটানা পাঁচ দিন পাঁচ রাত সাগর বুকেই আবার কাটিয়ে চলতে হল তাদের। এই কালের মধ্যে দিনের বেলা বারেকের জন্যও সূর্যের মুখ দেখা গেল না, রাতেও সুযোগ ঘটল না চাঁদ কি তারার মুখ দেখার। শুধু মেঘ আর মেঘ, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। ঘড়ি কিংবা দিগনির্ণয় যন্ত্র কোনটিই ব্যবহার করার উপায় রইল না। শুধু অসহায় ভাবে চরম অমঙ্গলকর একটা কিছু ঘনিয়ে আসার আতঙ্কে মুহূর্ত গুণে চলল সকলে।

তবে এরই মধ্যে অলৌকিক আখ্যা দেয়ার মতো একটি কাণ্ড ঘটে গেল। খোলে জল ঢোকার দরুন যে তিনটি জাহাজ কাত হয়ে পড়েছিল তার লোকজনেরা কিন্তু এই বুক হিম ক'রে দেয়া ঝড় বাদলের মধ্যেও সকলেই নিরাপদে কূলে পৌঁছে গেল।

॥ ছয় ॥

পাঁচদিন পর প্রকৃতি দেবীর মনে করুণার সঞ্চার হল। মাতাল বাতাসের নেশার ঘোর ধীরে ধীরে কেটে গেল কিছুটা। জাহাজগুলিকে দমনের বন্দর ঘাটে ভেড়ানো সম্ভব হল। কিন্তু সেগুলি তখন আর ফিরে সাগর-যাত্রা করার মতো অবস্থায় নেই। ডুবে চলা জাহাজ তিনটি থেকে যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও কামান উদ্ধার করা সম্ভব হল তা ক'রে দমনের শাসনকর্তা মালিক এসেদের জিম্মায় রাখলেন সীদী আলী। গুজরাট অধিপতি সুলতান আহমদের আমল থেকেই ইনি দমনের শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন ক'রে চলেছেন।

বন্দরে তখন কয়েকটি জঙ্ক বা বড়ো জাহাজ অপেক্ষা করছিল (চীনা বা তারই আদলে গড়া জাহাজগুলিকে সাধারণতঃ জঙ্ক নামে অভিহিত করা হয়। ইবন বাতুতা দ্রষ্টব্য)। এগুলির মালিক হলেন সমিরি (সামুরাই)। তিনি কালিকটের অধিপতি। সেগুলির অধিনায়কেরা সীদী আলীর জাহাজে এসে দেখা করলেন তার সাথে। তুর্কী সম্রাটের প্রতি তাদের সামুরাইয়ের বন্ধু মনোভাবের কথা জানিয়ে আশ্বস্ত করলেন তাকে।

"তারা একটি পত্রও দিলেন আমাদের কাছে। তাতে বলা হয়েছে, সমিরি (সামুরাই) অহর্নিশ পর্তুগীজ কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে চলেছেন। (এ ব্যাপারে তাকে সহায়তা করার জন্য) দিশারী আলীর পথ-নির্দেশনায় মিশর থেকে (তুর্কী সম্রাটের) রাজকীয় নৌ-বহর-এর আগমন প্রত্যাশা ক'রে চলেছেন তিনি। পর্তুগীজদের (পুরাপুরি) বিতাড়নই এ যুদ্ধের লক্ষ্য।"

দমনের শাসনকর্তা মালিক এসাদ-এর কাছ থেকে আভাস

পাওয়া গেল পর্তুগীজদের একটি বহর অল্পকালের মধ্যে এখানে এসে পড়বে। শুনে সীদী আলী রঈস তাদের এড়িয়ে চলার জন্য মনস্থ করলেন। ঠিক করলেন, সম্ভব হলে সুরাট দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেবেন। পর্তুগীজ নৌবহরের আসার খবর নাবিকদের কানেও গেল। প্রাণভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল তারা। হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তুর্কী নৌ-বহরের বর্তমানে যে অবস্থা তাতে পর্তুগীজদের প্রতিরোধ করা তাদের সাধ্যের বাইরে। ফলে অনেকেই তাড়াতাড়ি গিয়ে মালিক এসাদের অধীনে চাকুরি নিল। নৌকায় চেপে কতক ছুটল মূল-ভূখণ্ডে ঠাঁই নেয়ার জন্য। সেখানে পৌঁছে স্থলপথে পায়ে হেঁটে যাত্রা করল তারা সুরাটের দিকে।

অবশিষ্ট অনুগতদের নিয়ে সীদী আলী জাহাজেই থেকে গেলেন। সংগ্রহ করলেন প্রত্যেকটি জাহাজের জন্য একটি ক'রে ডিঙি বা দিশারী নৌকা। তারপর তাদের পথ-নির্দেশনায় যাত্রা করলেন জাহাজগুলিকে নিয়ে সুরাট বন্দরের দিকে। অপার বাধা-বিঘ্ন-দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা পেলেন তারা অবাধে গতি করার মতো সাগর পথের। সুরাটের কোতোয়াল বা দুর্গাধীশ আগা হংস স্বাগত সম্ভাষণ সহ এ সময়ে একটি পত্র পাঠাল সীদী আলীর কাছে। পত্রটি সুলতান আহমদের প্রধান উজীর উমদ-উল-মুল্‌কের লেখা। তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে এ অঞ্চলের কাছে পিঠে বহু পর্তুগীজ। দমন-ও একটি মুক্ত বন্দর। সুতরাং সীদী আলীর পক্ষে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু তিনি এখন বিপদপূর্ণ সাগর এলাকায়, সুতরাং তিনি সুরাট আসতে চাইলে সে অনুমতি তাকে দেয়া হবে। তা-ই চাইছিলেন সীদী আলী। সুতরাং এগিয়ে চললেন তিনি সুরাটের দিকে। সমানে পাঁচ দিন প্রবল স্রোতের সঙ্গে লড়াই ক'রে, ভাঁটার বিপরীত-মুখি টানের বেলা জলে নোঙর নামিয়ে এগিয়ে চলে চলে অবশেষে

পৌঁছলেন সুরাট বন্দরে। বসরা থেকে যাত্রা করার পর পুরো তিনটি মাস কেটে গেছে ইতিমধ্যে।

"সুরাটের মুসলমানেরা খুশীতে ফেটে পড়ল আমাদের দেখে। তাদের ত্রাণ-বার্তাবহ রূপে সংবর্ধনা জানাল আমাদের সবাইকে। বলল 'গুজরাটের এক দুঃসময়ে আপনারা এখানে এসেছেন। নোয়ার আমলের পর সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কখনো আর এমন বন্যা হয়নি। আবার স্মরণ কালের মধ্যে রূম দেশ (তুর্কী) থেকেও কখনো আগে এ বন্দরে আর কোন জাহাজ আসেনি। আমরা কায়মনোবাক্যে আশা ক'রে চলছিলাম, গুজরাটকে অটোমান সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন কল্পে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, ভারতীয় কাফেরদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য, ঈশ্বর করুণা ক'রে নিশ্চয়ই শীঘ্র কোন অটোমান নৌ-বহরকে এদেশে পাঠাবেন।"

সীদী আলীর এই বর্ণনা-কে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করলে নির্ভেজাল বলে মেনে নেয়া কঠিন। সুতরাং মনে হয়, আপন সম্রাটের স্তাবকতা করতে গিয়ে কিছুটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি এখানে।

তুর্কী বহরের এই আগমনে সুরাটের মুসলমানদের একাংশ যে খুশী হয়েছেন তা অবশ্যই ঠিক। তবে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার আগ্রহে নয়। তার কারণ, এ সময়কার গুজরাটের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সে পরিস্থিতির কথা সীদী আলীর মুখেই শোনা যাক।

"(দুঃসময় বা) গণ্ডগোলকর পরিস্থিতির প্রকৃত কারণ এরকমটি। গুজরাট অধিপতি সুলতান বহাদুরের (প্রকৃতপক্ষে মাহমুদ তৃতীয় ১৫৩৮-১৫৫৪) মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করলেন তার এক বারো বছরের বালক আত্মীয় (আহমদ-তৃতীয় ১৫৫৪-১৫৬১)। সেনাবাহিনীও তার আধিপত্য

স্বীকার ক'রে নিল। কিন্তু অভিজাতদের মধ্যে একজন, নাসির-উল-মুল্‌ক তার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। নিজেকেই রাজা বলে ঘোষণা করলেন তিনি। বহু অনুগামী ছিল তার। বুরুজের দুর্গটি (ভরোজ বা ব্রোচ) তিনি দখল ক'রে বসলেন। এটির অধিকার বজায় রাখার মতো প্রচুর সৈন্য সেখানে রেখে অবশিষ্টদের নিয়ে অন্য শহর দখলে অগ্রসর হলেন। গোয়ার (পর্তুগীজ) কাফেরদের শাসনকর্তার কাছেও তিনি সাহায্যের আবেদন জানালেন। প্রতিদান হিসাবে প্রতিশ্রুতি দিলেন গুজরাটের উপকূল-স্থিত বন্দরগুলি অর্থাৎ দমন, সুরাট, বুরুজ (ব্রোচ), কেতবায় (কম্বায়েত বা কাম্বে), সোমনাথ, মঙ্গলির (মঙ্গরোল), ফরমিয়ান প্রভৃতি অবাধ ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা। যার ফলে আমাদের (অর্থাৎ স্থানীয় মুসলমান বণিকদের) এ অঞ্চলগুলি ত্যাগ ক'রে ভেতর অঞ্চলে গিয়ে ঠাঁই নিতে হবে।

"সুলতান আহমদ ঠিক এই সময়ে বুরুজ অভিযানের জন্য সৈন্য সংগ্রহ ক'রে চলছিলেন। আমাদের আগমন সংবাদ পেয়ে তিনি আমাদের বাহিনী থেকে দুশো বন্দুকচী ও অন্যান্য সেনা নিলেন। যাত্রা করলেন বুরুজের দিকে। আমরা যারা (সুরাট) পড়ে রইলাম, তৃতীয় দিনে তাদের আক্রমণ করল কাফের (পর্তুগীজ) নৌ-সেনা-নায়করা। গোয়া, দিউ, শিয়ল, বসেই ও প্রোবদোর (পোরবন্দর) এই পাঁচটি বন্দরের কাফের নৌ-অধিনায়করা সাতটি বড় গ্যালিয়ন ও আশিটি গুরাব নিয়ে সম্মিলিত ভাবে। আমরা উপকূলের ভূভাগে গিয়ে ঠাঁই নিলাম। সেখানে তাঁবু খাটিয়ে, প্রতিরোধ পরিখা খনন ক'রে একটানা দুমাস যুদ্ধের জন্য সবরকম আয়োজন ক'রে চললাম। কাফেরদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ স্বেচ্ছাচারী নাসির-উল-মুল্‌ক আমাকে হত্যার জন্য খুনীদের নিয়োগ করল। প্রহরীরা তা আবিষ্কার ক'রে ফেলায় পালিয়ে

গেল তারা। এরপর আবার খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আমাকে হত্যার উদ্যম নিলেন তিনি। সুরাটের কোতোয়াল আমাকে সতর্ক ক'রে দেয়ার দরুন বিফল হল তার সে প্রয়াসও। ইতিমধ্যে সুলতান আহমদ বুরুজ দুর্গ দখলে সফল হলেন। সুরাট থেকে নিয়ে যাওয়া হাতি ও সেনাদলকে তার দুই পদস্থ কর্মচারী খুদাবন্দ ও জহাঙ্গীরকে দিয়ে আবার সুরাট ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। নিজে যাত্রা করলেন আহমদাবাদ। সেখানে ইতিমধ্যে আহমদ নামে সুলতান আহমদেরই আর এক বালক আত্মীয় বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বসেছে। যুদ্ধ হল অল্পদিনের মধ্যেই। বিদ্রোহী জখম হল রণক্ষেত্রে। হসন খান নামে তার এক অনুগামীও নিহত হল সে-যুদ্ধে। সেনারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। সুলতান আহমদ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এদিকে নাসির-উল-মুল্‌কও ব্যর্থকাম হয়ে আপন দুর্ভাগ্যের দরুন মানসিক আঘাতে মারা গেলেন। আবার শান্তির পরিবেশ ফিরে এল গুজরাটে।

"কাফের (পর্তুগীজ)-রা এ ঘটনার খবর পেয়ে (সুরাটে) খোদাবন্দ খানের কাছে দূত পাঠাল। জানাল: তাদের নজর সুরাটের ওপর নয়, যা কিছু শত্রুতা তারা ক'রে চলেছে তার প্রধান লক্ষ্য হল মিশরের নৌ-সেনাধ্যক্ষ অর্থাৎ এই অধম। তারা দাবি করল, আমাকে তাদের হাতে অর্পণ করতে হবে। তাদের সে দাবি প্রত্যাখ্যাত হল। আমার সৈন্যরা তো (তাদের এই স্পর্ধার খবর পেয়ে) দূতকে হত্যা করার জন্য গরম হয়ে উঠল। আমরা এখন বিদেশের মাটিতে এবং এখানে এরকম কোন হঠ-কারিতা করা উচিত হবে না একথা বুঝিয়ে তাদের আমি শান্ত করলাম। অল্পকালের মধ্যেই আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল। আমারই একটি জাহাজের এক কাফের বন্দুকচী গিয়ে যোগ দিল (পর্তুগীজ)-দূতের জাহাজে। আমাদের ভেতরকার বহু খবরই সে জানতো। কোরবান উৎসবের পর যাতে আমরা এস্থান ত্যাগ

ক'রে যেতে না পারি তারই ব্যবস্থা গ্রহণে পর্তুগীজদের সাহায্য ক'রে চলল সে। আমার সেনাদের কানে সে খবর যেতেই তারা দূতের জাহাজে চড়াও হয়ে সেই দুষ্কৃতিকারীকে পাকড়াও ক'রে সেখানেই হত্যা করল। এঘটনা দূতকে বিশেষ ভাবে সতর্ক ও উদ্বিগ্ন ক'রে তুলল।

"গুজরাটে তাল প্রজাতের বিশেষ এক ধরনের গাছ রয়েছে, নাম তার তরি অগাজি (তাড়িগাছ=তালগাছ)। তার ডালের গোড়া থেকে বাটির মতো চেহারার ফলের কাঁদি জন্মায়। এগুলিকে চেঁছে তার নিচে পাত্র পেতে রাখলে এক ধরনের মধুর রসক্ষরণ হয়ে চলে। অনেকটা আরকের মতো। এই রসকে রোদে রাখলে অল্পক্ষণের মধ্যেই অতি চমৎকার সুরায় পরিণত হয় (তাড়ি মদ)। সেই কারণে যেখানেই এ ধরনের গাছ রয়েছে সেখানেই তার নিচে এই সুরা-ঘাঁটি রয়েছে। সৈন্যদের কাছে এগুলি এক বিরাট আকর্ষণ। "আমার বাহিনীর কতক লোকও এই নিষিদ্ধ পানীয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। এবং তারই মত্ততাবশে তাদের সর্দারকে হত্যার পরিকল্পনা আঁটল। এই লম্পটদের মধ্যে য়াগমুর নামের এক ছোকরা আচমকা এক সন্ধ্যায় সারকাসিয়ানদের সর্দার হুসেন আগার কাছে হাজির হল। কয়েকজন সাথীও তাকে সাহায্যের জন্য সেখানে ছুটে গেল। বাধল ছোটখাটো একটি সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষে দুজন যুবক আহত হল এবং হাজী মেমী নামের একজন যুবক মারা পড়ল। সৈন্যরা তখন আমার কাছে জড়ো হয়ে আবেদন জানাতে থাকল দুষ্কৃতিকারীকে শাস্তি দেয়ার জন্য। আমি আবার তাদের স্মরণ করিয়ে দিলামঃ আমরা বিদেশের মাটিতে, অন্য এক পাদিশাহের রাজ্যে রয়েছি। এখানে আমাদের বিধি-বিধান অচল। 'কি!' শুনে চীৎকার জুড়লে তারাঃ 'আমাদের পাদিশাহের কানুন সর্বত্র কার্যকরী। আপনি আমাদের অধ্যক্ষ, আমাদের কানুন অনুযায়ী আপনি অপরাধীর বিচার ক'রে দণ্ড দিন,

আমরা সে রায় কার্যকরী করব।' অগত্যা আমি 'চোখের বদলায় চোখ, জীবনের বদলায় জীবন, নাকের বদলায় নাক, কানের বদলায় কান ইত্যাকার' কোরান নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি সম্পর্কে রায় দিলাম।"

"লোকটির প্রাণদণ্ড কার্যকরী করা হল, শান্তি ফিরে এল বাহিনী মধ্যে। স্থানীয় অভিজাত মহল এ ঘটনার খবর শুনে তা থেকে স্মরণীয় শিক্ষা গ্রহণ করল। অন্যদিকে (পর্তুগীজ) দূত তৎক্ষণাৎ এক যান ভাড়া ক'রে ছুটলেন সুলতান আহমদের কাছে।

"আমার বাহিনী মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে চলছিল। সুরাটে খোদাবন্দ তাদের দৈনিক ৫০ থেকে ৬০ পরস দিয়ে যাচ্ছিলেন। বুরুজে (ব্রোচ) আদিল খানও এই একই হারে দিয়েছেন। অবশেষে তাদের সেই পাথর চাপা ক্ষোভ বহ্নিমান হল। তারা বলতে লাগল ঃ প্রায় দু বছরের মতো হতে চললো আমরা বেতন পাইনি। জিনিষপত্র যা ছিল তাও খোয়া গেছে, জাহাজগুলিরও ঝরঝরে অবস্থা—তার খোল এখন রীতিমতো জীর্ণ, সুতরাং মিশর ফেরার সম্ভাবনাও রহিত হয়ে গেছে।" এর শেষ পরিণতি দাঁড়াল এই যে বাহিনীর অধিকাংশই গুজরাটে চাকুরি নিল।

"পরিত্যক্ত জাহাজগুলিকে তার যা কিছু যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম হাতিয়ার সহ খোদাবন্দ খানের হাতে সমর্পণ করা হল। সর্ত হলো, যে দামে বিক্রী করা হল তা তিনি অবিলম্বে তুরস্ক দেশের সুমহান সরকারকে মিটিয়ে দেবেন।

"এ সম্পর্কে খোদাবন্দ খান ও আদিল খানের কাছ থেকে স্বীকৃতি পত্র লাভ করার পর আহমদাবাদে যাবার জন্য রওনা হলাম। হিজরী ৯৬২-র মহরম মাস শুরু হয়েছে তখন সবে (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরের শেষভাগ)। সঙ্গে মিশরীয় 'আধুনিক সেনাবাহিনী'র কেতখোদা বা প্রধান মুস্তাফা আগা এবং বন্দুকচীদের

অধিনায়ক আলী আগা। তারা দুজনেই পাদিশাহের প্রতি অনুগত থেকে যান। ছিল এছাড়া আরো পঞ্চাশ জনের মতো লোক। বুরুজ (ভরোজ=ব্রোচ) থেকে বেলোদ্র (বদোদর) পৌঁছতে দিনকয়েক সময় নিল। এগিয়ে চললাম তারপর চাম্পানেরের দিকে।

"যেতে যেতে পথে অতি কৌতূহলকর কিছু কিছু গাছ চোখে পড়ল। সেগুলি এত লম্বা যে তার মাথা আকাশ ছুঁয়েছে যেন! ডালে ডালে ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড়। আকারে এত বড় যে ডানা মেলা অবস্থায় তাদের মাপ নিলে আড়াআড়ি ৪০ ইঞ্চির কম হবে না। এক ধরনের গাছ সত্যিই অবাক ক'রে দেয়ার মতো। সেগুলির ডাল থেকে শিকড়ের গুচ্ছ নেমে এসেছে। সেগুলি মাটি ছুঁতে পারলেই তার গভীরে চলে গিয়ে ডালটিকে যেন একটি স্বতন্ত্র গাছে পরিণত করে। এভাবে একটি গাছই নেয় দশ থেকে কুড়িটি গাছের রূপ। এ গাছগুলির নাম হল তোবি গাছ (বট গাছ)। এর এক একটির ছায়ায় হাজারেরও বেশি লোক ঠাঁই নিতে পারে। কিছু জোকুম গাছও চোখে পড়ল (কোরান অনুসারে এ গাছ কেবল নরকেই জন্মায়। এর ফল কলার মতো অনেকটা। নরক-গামীরা তাই খেয়ে প্রাণ ধারণ করে)। অজস্র শুক পাখি। বানরের তো কথাই নেই। প্রতিদিন বিকালে তাঁবু ফেলতেই হাজারে হাজারে এসে দেখা দেয় সেখানে। বাচ্চাগুলিকে কাঁখে বয়ে নিয়ে চলে। ক'রে চলে বিচিত্র রকমের যত অঙ্গ ও মুখভঙ্গী। তখন জহান শাহের লেখা কাহিনীগুলির কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে যায়। তার মতে এই বিশেষ প্রাণীটি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করলেও কাউকেই দলপতিত্বে বরণ করে না। রাতের আঁধার নেমে এলেই নিজ নিজ জায়গামতো ফিরে যায়।

"অসংখ্য ঝঞ্ঝাট ও দুর্বিপাক সয়ে শেষ পর্যন্ত মাহমুদাবাদে পৌঁছলাম আমরা। এবং তারপর গুজরাটের রাজধানী

আহমদাবাদে। মোট পঞ্চাশদিন পথ চলতে হল আমাদের। রাজধানীতে পৌছে দেখা করলাম সুলতানের সাথে। গেলাম দেখা করতে তার প্রধান ওয়জীর ইমাদ-উল-মুলূক এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গেও। পরিচয় পত্রাদি পেশ করার পর সুলতান আমাকে অতি সদয় চিত্তে গ্রহণ করলেন। আমাদের মহান পাদিশাহের প্রতি তার অনুরক্তির কথা জানিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। একটি ঘোড়া, এক কটার উট (কটার = কাতার = দল, আকবরের আমলে ৫টি উটের এক একটি দলকে কটার রূপে গণ্য করা হত।) এবং যাত্রার জন্য পথ-খরচাও দিলেন আমায়।

"আহমদাবাদের কাছেই চরকেশ (সরখেচ বা সরখেজ)-এ শেইখ আহমদ মগরবীর সমাধিকুঞ্জ (আইন-ই আকবরী অনুসারে আহমদ খত্তু।)। তীর্থ করে এলাম সেখানে।

"ইমাদ-উল-মুলূকের বাড়িতে বসে আছি একদিন, এলেন এমন সময় কাফের (পর্তুগীজ) রাজদূত। দেখা হল তার সঙ্গে। আমাদের আপ্যায়ন-কর্তা তাকে বললেন ঃ 'তুর্কী সুলতানের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের জাহাজ তার সাম্রাজ্যের বন্দরগুলিতে যাতায়াত করে। যদি সে সুবিধা হারাই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। তার ওপর তিনি হলেন ইসলাম জগতের পাদিশাহ। সুতরাং তার নৌ-সেনাধ্যক্ষকে আমরা আপনার হাতে তুলে দেব এমনটি প্রত্যাশা করা মোটেই সঙ্গত নয়।' রাজদূতের আবদার ও তার জবাব শুনে আমি রীতিমতো মেজাজ হারিয়ে ফেললাম। রাজদূতের দিকে তাকিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলাম ঃ আপনাদের এইসব স্পর্ধাকর কথাবার্তা থামান। নেহাৎ এক ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত বহর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এখানে। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে শপথ নিচ্ছি, অতি অল্পকালের মধ্যেই আপনারা দেখতে পাবেন যে মহান পাদশার বিজয়ী সেনাদলের কাছে শুধু হরমুজ-ই নয়, গোয়াও নতজানু হয়েছে।

"একথা শুনে সেই কাফের (রাজদূত) বলে উঠল : একটি পাখিও যে এরপর ভারতের কোন বন্দর পথ দিয়ে উড়ে পালাবে সে সুযোগ আর হবে না। আমি উত্তর দিলাম : সাগর পথ দিয়েই যে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই, যাবার জন্য স্থলপথও রয়েছে। শুনে চুপ হয়ে গেল সে। প্রসঙ্গের এখানেই ইতি ঘটল।

"এ ঘটনার কয়েকদিন পরেই সুলতান আহমদ আমাকে বিরাট অঙ্কের আয় সহ বুরুজ প্রদেশের সুরক্ষা ভার দেয়ার প্রস্তাব করলেন। আমি রাজী হলাম না। উত্তর দিলাম, আমাকে পুরো দেশটি দিলেও এখানে থাকার কোন আকাঙ্খা নেই আমার।

"হঠাৎ এক রাতে খলীফা মূর্তজা আলীকে স্বপ্নে দেখলাম। সামনে আমার আলীর সীল মোহরের ছাপ দেয়া একখণ্ড কাগজ। মন থেকে সব ভয় মুছে গেল। এ সীল আমাকে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বরের মনোবাসনার প্রকাশ। এর জোরে সমস্ত বৈদেশিক সাগর পথ এখন আমার কর্তৃত্বাধীন।

"প্রভাতে সঙ্গীদের শোনালাম সে স্বপ্নের কথা। তারাও উৎফুল্ল হয়ে উঠল আমার মতো। চাইলাম সুলতানের কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি। আমাদের সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সে আবেদন তিনি মঞ্জুর করলেন।

"বনিয়া-দের এই দেশটিতে যারা শিক্ষিত সম্প্রদায় (সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে) একটি বিশেষ উপগোষ্ঠী বাট (ভাট) নামে পরিচিত। এদের পেশা হল সওদাগর ও পর্যটকদের একস্থান থেকে আরেক স্থানে পথপ্রদর্শক রূপে নিয়ে যাওয়া। অতি সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এরা যাত্রীদের পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। যারা এ অঞ্চলের অশ্বারোহী সৈনিক সেই রাজপুতের দল যদি পথে যাত্রীদের আক্রমণ করে তবে এই বাটেরা নিজেদের বুক লক্ষ্য ক'রে ছোরা উঁচিয়ে বলে যে যাত্রীদের কারো বিন্দুমাত্র কিছু ক্ষতি করলে সে সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করবে। বাটদের প্রতি

শ্রদ্ধা (ও ব্রহ্মহত্যার ভয়) বশতঃ রাজপুতেরা স্বভাবতঃই তখন দুষ্কর্ম থেকে বিরত হয়। যাত্রীরা পীড়ন ও লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। কখনো-সখনো তাদের কথার গুরুত্ব প্রতিপাদনের জন্য বাটেরা সত্যি সত্যিই নিজেদের ছোরাবিদ্ধ ক'রে মৃত্যু বরণ করে। যদি এরকম কোন ঘটনা ঘটে, যাত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বাটকে সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করতে হয়, তবে তাকে এক ভয়ংকর অমঙ্গলের সংকেত রূপে গণ্য করা হয় । সেই সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জন-সাধারণ তখন দুষ্কৃতিকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার দাবি তোলে। রাজপুত-প্রধান তখন যে শুধু দুষ্কৃতিকারীদেরই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন তাই নয়, তাদের পুত্র-কন্যাদেরও সরিয়ে দেয়া হয়। এক কথায় পুরো বংশকেই নির্মূল করা হয় তখন। আমাদের নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়ার জন্য আহমদাবাদের মুসলমানেরা এরূপ দুজন বাট সংগ্রহ ক'রে দিলেন। অতএব, ওই বছরের সফর মাসের মাঝামাঝি তুর্কী যাবার লক্ষ্য নিয়ে তাদের সঙ্গে স্থলপথে রওনা হলাম আমরা।

"যানে চেপে এগিয়ে চললাম। পাঁচদিনের দিন পৌঁছলাম পাটনা (পত্তন)। তীর্থ করলাম সেখানকার পীর শেইখ নিজামের সমাধিতে। (কচ্ছের রান এলাকার নিকটবর্তী) রদনপুরের শাসক বহলুজ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের জন্য শের খান ও তার ভাই মুসা খান তখন এখান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। পাছে আমরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেই এই আশঙ্কায় স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের আটকে দিল। যতদিন না যুদ্ধ শেষ হয় কিছুতেই তারা আমাদের স্থানত্যাগ করতে দেবে না। বোঝালাম, কোন পক্ষকে কোনরকমে মদত দেয়ার জন্য আমরা এখানে আসিনি। চাই শুধু নির্বিবাদে আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখতে। আর এ ব্যাপারে তাদের রাজার অনুমতি পত্রও রয়েছে সঙ্গে। অনেক বোঝাবার

পর আমাদের ছেড়ে দিল তারা। পাঁচ দিন পথ চলার পর পেঁৗছলাম এসে রদনপুরে। সেখানে মাহমুদ খানের কাছে উপস্থিত করা হল আমাকে। বেশ রূঢ় আচরণ করলেন তিনি আমার সঙ্গে। আমার তিনজন সঙ্গীকে জোর ক'রে রেখে দিতে চাইলেন। নয়তো কিছুতেই আমাদের যেতে দেবেন না।

"যেতে যেতে পথে কতক ভদ্র রাজপুতের সঙ্গে দেখা ও পরিচয় হল। তাদের প্রধান প্রচুর উপকারে এলো আমাদের। আমাকে একটি অবাধ ছাড়পত্র লিখে দিলেন তিনি। আহমদাবাদের অধিবাসীরা যে তুজন বাট (ভাট)-কে সঙ্গে দিয়েছিলেন তাদের ছেড়ে দিলাম এবার। করলাম কতক উট ভাড়া। শুরু হল আবার আমাদের পথযাত্রা। রবিউল অওয়াল-এর পয়লা তারিখ সেদিন।"

॥ সাত ॥

দশদিন একটানা পথ চলার পর সীদী আলী পৌঁছলেন সদলবলে পরকর-এ। 'রাজপুতদের শহর এটি।'

পরকর কচ্ছের রান এলাকার অপর পারে অবস্থিত। বর্তমানে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে, সীমান্ত নিকটবর্তী একটি শহর।

এখানে আচমকা একদল কাফেরের (হিন্দু, রাজপুত) কবলে পড়লেন তারা। রাজপুত-প্রধানের দেয়া ছাড়পত্রটি উপকারে এল এবার। সেটি দেখিয়ে ও সামান্য কতক সামগ্রী উপহার দিয়ে ছাড় পেয়ে গেলেন। তবে বিপদ যখন একবার এসে তার দাঁত বসাতে চেয়েছে তখন বারবার আসতে পারে এই আশঙ্কা ক'রে স্বভাবতঃই এবার তারা চোখ-কান খোলা রেখে চলতে শুরু করলেন। আশঙ্কাকে সত্য ক'রে ঠিক পরদিনই একদল জঙ্গী রাজপুত খোলামেলা যুদ্ধ বাধিয়ে বসল তাদের সঙ্গে। সীদী আলী ও তার সঙ্গীরা তো মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে উটগুলিকে নিজেদের চারপাশে বৃত্তাকারে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে দিয়ে তার আড়াল থেকে সমানে চারিদিকে শত্রুপক্ষের ওপর বন্দুক দাগিয়ে চললেন তারা। এ ধরনের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল না হামলাকারীরা। সুতরাং বলে পাঠালে ঃ তারা যুদ্ধ করতে আসেনি, এসেছে পথ-শুল্ক আদায় করতে। সীদী আলী রঈস উত্তর দিলেন ঃ আমরা সওদাগর নই। ওষুধ আর মোহর ছাড়া আর কোনকিছুই নেই আমাদের সঙ্গে।

এই 'মোহর' কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা নয়। এক ধরনের পাথর। চলতি আখ্যায়িকা অনুসারে সাপ ও নাগের মাথায় মেলে এগুলি। এবং অলৌকিক গুণ-সম্পন্ন। তাই বহু দরবেশই তাদের মালায়

এগুলিকে নিয়ে ফেরে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের এগুলি দিয়ে ফায়দা ওঠায়।

যাই হোক, সীদী আলী আরো জানালেন, 'এ সবের জন্য ইতিমধ্যেই আমরা শুল্ক দিয়েছি। তবু, আবারও যদি দিতে হয় তাতেও রাজী আছি।' এ উত্তরে কাজ হল। তাদের আর না ঘাঁটিয়ে চলে যেতে দিল হামলাকারী রাজপুতেরা। প্রায় দশদিন একটানা মরু ও বালি ভরাট অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার পর পৌঁছলেন তারা সিন্ধুর এক সীমান্ত শহর ওয়ঙ্গা-য়। এখানে আবার নতুন ক'রে উট ভাড়া করলেন। পাঁচদিন পথ চলে এসে গেলেন জুনা-য় (জুনাগড়) ও তারপর বাগ-ই ফথ-এ।

"সিন্দ-এর সিংহাসনে তখন শাহ হুসেন মীর্জা। চল্লিশ বছর ধরে রাজত্ব ক'রে আসছেন তিনি। তবে বছর পাঁচেক হল প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন। ঘোড়ায় আর চড়তে পারেন না। তাই শিহুন নদীতে (সিন্ধু নদ) জাহাজে চেপেই যা এখন ঘুরে বেড়ান।

"সিন্দ-এর রাজধানী হল তত (তত্ত্ব)। সেখানকার সামরিক প্রধান ঈশা তরখান শাহ হুসেন মীর্জার কতক সুযোগ্য পদস্থ কর্মচারীকে হত্যা ক'রে তার নসরাবাদের কোষাগারটি দখল করেছেন ইদানীং। সেই সম্পদ আপন অনুগামীদের মধ্যে বেঁটে দিয়ে, হুমায়ুন শাহ নাম নিয়ে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা ক'রে আপন নামে খুত্‌বা পাঠ করিয়েছেন। এ ঘটনার পর শাহ হুসেন মীর্জা আপন দুধ-ভাই সুলতান মাহমুদকে স্থলবাহিনীর সেনানায়ক পদে নিয়োগ করেছেন, এবং নিজে ৪০০ জাহাজ নিয়ে বিদ্রোহ দমনে বার হয়েছেন। আমার আগমন সংবাদ শুনে তিনি মহাসমাদরে আমাকে স্বাগত জানালেন। রবিয়া-অল-শনি মাসের শুরু হয়েছে তখন সবে। উৎসবাদি উপলক্ষে ব্যবহার যোগ্য একপ্রস্থ পোশাক তিনি দিলেন আমাকে, বিশেষিত করলেন আমাদের সবাইকে 'ঈশ্বর প্রেরিত সেনা' উপাধিতে। এ ছাড়াও,

আমাকে প্রস্তাব দিলেন বন্দর লহুরী বা দরায়ুলী সিন্ধির শাসন-কর্তার পদ গ্রহণের। আমি প্রত্যাখ্যান করলাম তা। যাত্রা শুরু করার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। কিন্তু আমাকে প্রকারান্তরে জানিয়ে দেয়া হল, যতদিন না এই অভিযান সাফল্যকর ভাবে শেষ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সে অনুমতি মেলার সম্ভাবনা নেই। আমাদের সুমহান পাদিশাহের কাছেও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা ক'রে একটি পত্র লিখলেন তিনি। এক কথায়, ইশা খানের সঙ্গে এই যুদ্ধে আমরা যাতে কোনরকম ভাবে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ না পাই তার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি একটুও বিশ্রাম নিলেন না। মুসলমানরা তাকে অনেক ক'রে বোঝালেন যে আমাদের বন্দুকগুলির এমন কিছুই জাদুকরী ক্ষমতা নেই যার ফলে তাদের কোন ক্ষতি ঘটতে পারে। তাছাড়া 'আমরা সকলেই কি একই জাতির লোক নই, আমাদের অনেকেরই ছেলে ও ভাইয়েরা কি বিদ্রোহীদের দলে নেই?' একেবারে নিরেট সত্য কথা। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হল না।

"সেখানে থাকাকালে একদিন গিয়ে শেইখ আবদুল ওয়হাবের সঙ্গে দেখা ক'রে তার আশীর্বাদ নিয়ে এলাম। তীর্থ করলাম শেইখ জমালী ও মীরীর সমাধিতেও।

"এ অভিযান একমাস ধরে চলল। জাঙ্গাল তুলে তার ওপরে কামান বসানো হলো। কিন্তু তত (তত্ত্ব দুর্গটি) একটি দ্বীপের মধ্যে থাকার দরুন কামানের গোলা তাকে স্পর্শও করতে পারল না। কিছুতেই জয় করা সম্ভব হল না সে দুর্গ। এ সত্ত্বেও উভয় পক্ষেরই বহু লোকের জীবনান্ত ঘটল। একটি রফানামায়ও পৌঁছল দুপক্ষ শেষপর্যন্ত। মীর ঈশা (তরখান) দিল্লীর হুমায়ুন পাদিশাহের আনুগত্য বর্জন ক'রে হুসেন মীর্জার অনুগামী হলেন পুনরায়। আপন পুত্র মীর সালিহকে আনুগত্যের উপঢৌকন সহ পাঠালেন তার কাছে। অন্য দিকে, যে কোষাগারের

ধনসম্পদ মীর ঈশা তার বাহিনী মধ্যে বেঁটে দিয়েছিলেন তার অবশিষ্টাংশ হুসেন মীর্জা মীর সালিহকে দান করলেন। ঈশাকে তার পূর্বপদেই বহাল রাখা হল। তার আনুগত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে মীর্জা তার ওয়জীর মোল্লা য়ারীকে দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে তার ঘোষণা পাঠালেন তার কাছে। প্রধান প্রতীক-বাহক তুগ-বেগীকে দিয়ে একটি নকারাও পাঠালেন। অরঘুন ও তরখান গোষ্ঠীর দশজন বিদ্রোহীকেও মুক্ত ক'রে দেয়া হল (এরা মধ্য এশিয়ার দুই তুর্কী উপজাতির বংশধর)। ঈশার পক্ষ নিয়েছিল এরা। মীর ঈশাও (চুক্তি অনুযায়ী) তার যা করণীয় তা পালন করলেন। হুসেন শাহর (আটক করা) পত্নী হাজী বেগমকে পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে। জমাদীউল অওয়াল মাসের প্রথম দিকে সুলতান মাহমুদ স্থলপথে এবং শাহ হুসেন জলপথে বকর শহরে ফিরে চললেন এসবের পর।

"পত্নী (হাজী বেগম) ফিরে এসে তার সঙ্গে মিলিত হবার পর ঠিক দশদিনের দিন শাহ হুসেন এই জীবন-অঙ্গন থেকে বিদায় নিলেন। সন্দেহ করা হল, তার পত্নীই বিষ খাইয়েছেন তাকে।

"শাহ হুসেনের মৃত্যুর পর দুধ-ভাই সুলতান মহম্মদ তার রেখে যাওয়া সম্পদ সরাসরি তিন ভাগ করলেন। এক ভাগ মৃতের পত্নীদের জন্য। (এক ভাগ নিজের জন্য)। অন্য ভাগ এক খোজার মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন তিনি মীর ঈশাকে। মরদেহ-ও তত (তত্ত্ব) নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। আমাকে তিনি নিজের একটি জাহাজ ব্যবহার করার জন্য ধার দিলেন। নিজে ঘোড়া, উট ও আনুষঙ্গিক নিয়ে স্থলপথে ভক্কর রওনা হলেন। এদিকে পঞ্চাশখানি জাহাজের প্রহরায় মীর্জার মরদেহ ও তার পত্নীকে যখন তত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই অবসরে সেনারা অবশিষ্ট জাহাজগুলির ওপর চড়াও হয়ে সব কিছু লুটপাট ক'রে নিল। নাবিকরা গেল পালিয়ে। আমরা যাত্রীরাই তখন বাধ্য হয়ে জাহাজ

চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করলাম। চারদিক থেকে জগতাই (চখতাই, মধ্যএশীয় মোঙ্গল বা মুঘল উপজাতি)-রা ঘিরে ফেলেছে আমাদের। নিরুপায় হয়ে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নিলাম হাতে, সাহস ভরে বাধা অতিক্রম ক'রে নিজেদের জীবন নিয়ে পালালাম। দশদিন ধরে স্রোতের সাথে একটানা লড়াই ক'রে উপস্থিত হলাম নসিরপুর। এ শহরটিকেও রাজা, অর্থাৎ রাজপুতদের প্রধান, লুটপাট ক'রে নিয়েছে ইতি মধ্যে।

"সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের স্বাগত জানাবার সাথে সাথে সংবাদ দিল মীর ঈশা (তরখান) দশহাজার সেনার এক দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে সুলতান মাহমুদের পিছু ধাওয়া করেছেন। অন্যদিকে তার পুত্র মীর সালিহ-ও ৮০টি জাহাজ সহ আমাদের পিছু নিয়ে অতি নিকটে এসে পড়েছেন। বুদ্ধি গুলিয়ে যাওয়ার মতো অতি জটিল পরিস্থিতি। তখুনি সিদ্ধান্ত নিলাম পিছু ফিরে যাওয়ার। অনেকক্ষণ সকলে একসঙ্গে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম। শুরু করলাম তারপর তত প্রত্যাবর্তন। তিন দিন পর নদীর বুকে মীর সালিহ-র নৌবহরের দর্শন পেলাম। সামান্য কতক উপহার নিয়ে জাহাজে গিয়ে দেখা করলাম তার সাথে। তিনি জানতে চাইলেন আমরা এখন কোথায় চলেছি। উত্তর দিলাম 'আপনার পিতার কাছে'। শুনে তিনি আমাদের তার সাথে ফিরে যাবার জন্য বললেন। জানালাম আমাদের জাহাজে একজনও নাবিক নেই বর্তমানে। তা শুনে তার নাবিকদের মধ্য থেকে পনের জনকে দিলেন আমাদের। বাধ্য করলেন এভাবে আবার তার সঙ্গে ফিরে যেতে। শুরু হল আবার দশ-দিনের এক ক্লান্তিকর যাত্রা। একদিন সিন্দের একটি ছোট শহরে মীর ঈশার সাথে দেখা করার সুযোগ হল। পূর্বে প্রয়াত মীর্জার অনুগত ছিলেন এমন কিছু ব্যক্তিকেও সেখানে দেখতে পেলাম। যুদ্ধ ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে তারা এখন শান্তির জন্য উৎসুক হয়ে

উঠেছেন। ঈশা আমাকে অতি সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন। আমার অতীত মার্জনা ক'রে দিন কয়েক তার কাছে কাটাবার অনুমতি দিলেন। বললেন ; কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তার পুত্র মীর সালিহ-কে পাদিশাহ হুমায়ূনের কাছে পাঠাতে চান। আমিও ইচ্ছা করলে তার রক্ষণাধীনে সেখানে যেতে পারি। তারপর তিনি যোগ করলেন ঃ 'নয়তো সুলতান মাহমুদ কখনো আপনাকে বকর (ভক্কর) পার হয়ে অন্যত্র যেতে দেবে না। সে হল ফারুক মীর্জার ছেলে। পাদিশাহ হবার স্বপ্ন দেখছে সে।' কিন্তু এ প্রস্তাব আমার দিক থেকে স্বাগত জানাবার মতো নয়, তাই জোর দিলাম অবিলম্বে আমার যাত্রা শুরু করার দিকে। প্রস্তাব করলাম, আমাদের কাছ থেকে যে জাহাজগুলি ইদানীং নিয়ে নেয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া হোক। এছাড়া একজন দূতকেও আগেভাগে (পাদিশাহ হুমায়ূনের কাছে) পাঠান উচিত। কেননা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সুলতান মাহমুদও খুব সম্ভব হয়তো পাদিশাহ (হুমায়ূন)-য়ের অধীনতা স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হবেন। ফলে সহজেই শান্তি স্থাপিত হতে পারে। ঈশা রাজী হয়ে গেলেন এ (দুই) প্রস্তাবে। পুরো নাবিক সহ সাতখানি জাহাজ দিলেন আমাকে। অন্যদিকে, নিজের অটল আনুগত্যের কথা জানিয়ে একখানি পত্র লিখে (দূত দিয়ে তা পাঠালেন) পাদশাহের কাছে। আমরাও আমাদের যাত্রা শুরু করলাম।

"নদীর বুকে বিরাট বিরাট সব মাছের (কুমীর ?) বিচরণ দৃশ্য আমাদের হতবাক ক'রে তুলল। বাকহারা হলাম নদীকূলে যে পরিমাণ বাঘের দর্শন পেলাম তা দেখেও। প্রায় অবিরাম লড়াই চালিয়ে যেতে হল যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আমরা গতি ক'রে চলেছি সেখানকার অধিবাসী সমচী ও মাচী উপজাতির লোকদের সঙ্গে। এভাবে পেঁছিলাম এক সময়ে শিহওয়ান। তারপর পতরি ও দিবল হয়ে অল্পকালের মধ্যেই পেঁাছে গেলাম

বুক্কুর (ভক্কর)। এসে প্রভাবিত ক'রে চললাম সুলতান মাহমুদ ও তার ওয়জীর মোল্লায়ারীকে। প্রথমজনকে সামান্য কিছু উপহারও দিলাম। অবশেষে সে হুমায়ূনের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিতে আগ্রহ দেখাল। উৎসুক হল মীর ঈশার সঙ্গে শান্তি স্থাপনার জন্যও।

"হুসেন মীর্জার মৃত্যুর একটি অক্ষর-ভিত্তিক কাল বিবরণী-গাথা (Chronogram) রচনা করলাম আমি। এবং দুটি গজল সহ সেটি সুলতান মাহমুদকে উপহার দিলাম। এরপর একদিন অনুরোধ জানালাম যাত্রা করার অনুমতি দানের জন্য। সম্মতি দিলেন তিনি। কিন্তু সুলতান হায়দারের এক পুত্র সুলতান বহাদুরের হামলার ফলে, কন্দহারের সড়ক তখন নিরাপদ নয়। তাছাড়া সিমূন (উষ্ণ বায়ু প্রবাহ)-এর মৌসুমও শুরু হয়ে গেছে। তাই সুলতান নিরাপত্তা রক্ষী দিয়ে লাহোরের সড়ক ধরে আমায় এগিয়ে দিতে চাইলেন। সাবধান ক'রে দিলেন, সেখানকার বিদ্রোহ ভাবাপন্ন উপজাতি জাঠদের সম্পর্কে যেন সদাসর্বদা সতর্ক থাকি। যাবার জন্য যে সড়কই নির্বাচন করি না কেন অনুকূল ঋতুর জন্য আরো সামান্য কিছুদিন অপেক্ষা করা দরকার। প্রকৃত পক্ষে পুরো একটি মাস আমাকে অপেক্ষা করতে হল। এ সময়ে এক রাতে মাকে স্বপ্নে দেখলাম আমি। বললেনঃ পরম-শ্রদ্ধেয়া ফতিমা-কে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। তার কাছ থেকে এই আনন্দ-সংবাদ পেয়েছেন যে আমি শীঘ্রই নিরাপদে সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরে আসছি।

"পরদিন সকালে সঙ্গীদের এ স্বপ্নের কথা জানাতে তারা মনোবলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। সুলতান মাহমুদও এ স্বপ্নের বিবরণ শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যাত্রার অনুমতি দিলেন। আমায় একটি সুন্দর ঘোড়া উপহার দিলেন তিনি। এ ছাড়া এক কটার উট, একটি সুন্দর বড় আর একটি ছোট তাঁবু এবং পথ খরচা। হুমায়ূনের কাছেও একটি সুপারিশ পত্র লিখে দিলেন। তার দেয়া

২৫০ জনের এক উট-আরোহী বাহিনীর রক্ষণাধীনে সিন্দ থেকে যাত্রা করলাম আমরা। শাবন মাসের মাঝামাঝি তখন। সুলতান হয়ে পাঁচ দিনে মভ দুর্গে এসে গেলাম। জাঠরা ভয়ানক উপদ্রবকারী বলে অরণ্য পথ এড়িয়ে প্রান্তরের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। দ্বিতীয় দিনে পেঁছিলাম এক নির্ঝরিণীকূলে। কিন্তু এক বিন্দুও জলের দেখা পেলাম না। সঙ্গীদের অনেকেই তখন খরায় ও তৃষ্ণায় একেবারে এলিয়ে পড়েছে। অগত্যা তাদের অতি উৎকৃষ্ট জাতের একটু একটু তরিয়াক (আফিম) খাইয়ে দিলাম। পরের দিনই সুস্থ হয়ে উঠল তারা। এই অভিজ্ঞতার পর আর আমরা মরু প্রান্তর ধরে এগিয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম না। ফিরে এলাম আবার মভ। প্রবাদ বাক্যে খাঁটি কথাই বলা হয়েছে ঃ নতুন লোক সবসময়েই অজ্ঞ। এই প্রান্তরে চড়ুই পাখির মতো বড় বড় আকারের পিঁপড়ে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমাদের।”

যে অরণ্য পথকে সকলে এড়াতে চেয়েছিল এবার সেই পথ ধরে যাবারই সিদ্ধান্ত নিতে হল। সুলতান মাহমুদের দেয়া রক্ষী বাহিনী তো ভীত হয়ে পড়ল। প্রায় একই অবস্থা সীদী আলীর সঙ্গীদেরও। সীদী আলী তাদের নানা বাণী শুনিয়ে উদ্দীপিত ক'রে তুললেন, মনে নতুন ক'রে সাহসের সঞ্চার ঘটালেন। যাত্রা করলেন সবাই। দলের সামনে, মাঝে ও পিছনে দশজন ক'রে বন্দুকধারীকে রাখলেন সীদী আলী। এভাবে, 'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করবেন এই অটুট বিশ্বাস নিয়ে', এগিয়ে চললেন তারা। তাদের দেখাদেখি অনেক সিন্ধু অধিবাসীও সাহসী হয়ে এরপর যাত্রীরূপে দলে যোগ দিল।

বহু-রকম বিপদ কাটিয়ে দশদিন পর পা রাখলেন তারা উচী-তে। এখানে পেঁছে শেইখ ইব্রাহীমের সাথে দেখা ক'রে তার আশীর্বাদ লাভ করলেন সীদী আলী। দর্শন করলেন শেইখ জমাল ও

জলালের সমাধিও। রমজান মাসের প্রথমে আবার যাত্রা আরম্ভ করলেন তারা। এলেন কর বা কিরি নদীর উপকূলে। (বর্তমানে এ নদীটি ঘর নামে চিহ্নিত)। ভেলায় চেপে পার হলেন। তারপর বিনা বাধায় এগিয়ে চলে পেঁছিলেন মছওয়ারা নদীকূলে। নৌকায় চেপে পার হলেন সে নদী। সেখানে তখন ৫০০ মতো জাঠ জটলা ক'রে চলেছে। কিন্তু সীদী আলীর দলের লোকদের হাতে বন্দুক দেখে চুপ রইল তারা, কোন রকম কিছু ক্ষতির চেষ্টা করল না। নির্বিবাদে এগিয়ে চলে রমজান মাসের পনেরো তারিখে পেঁছিলেন এসে মূলতান শহরে।

।। আট ।।

"মূলতান পৌঁছে তীর্থ করলাম বহাউদ্দীন জাকেরিয়া, রুকন-উদ্দীন ও সদরউদ্দীন এই তিন শেখের সমাধিতেই শুধু যা। শেইখ মহম্মদ রাজভীর আশীষ লাভের পর যাত্রা শুরুর জন্য অনুমতি চাইলাম সুলতান মীরমীরান মীর্জা হসনের কাছে। মঞ্জুর করলেন সে প্রার্থনা তিনি। বেরিয়ে পড়লাম লাহোরের উদ্দেশ্যে।

"সদকর পৌঁছে দর্শন করতে গেলাম শেইখ হমিদ-কে। পেলাম তার আশীষ। হলো আবার পথচলা শুরু। শওয়াল মাসের আরম্ভ-কালে উপস্থিত হলাম লাহোর।

এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন এইরকম : শের খানের অন্যতম পুত্র সলীম শাহের মৃত্যুর পর হিন্দুস্তানের পূর্বতন সম্রাট ইস্কান্দার (সেকেন্দার) খান আবার সিংহাসন অধিকার করলেন। পাদশাহ হুমায়ুনের কাছে এ সংবাদ পৌঁছতে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে কাবুল ত্যাগ ক'রে তার সেনাবাহিনী নিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে এলেন। করলেন লাহোর অধিকার। সরন্দের (শিরহিন্দ) কাছে ইস্কান্দার খানের সঙ্গে তার যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে জিতে গেলেন তিনি। পেয়ে গেলেন ৮০০ হাতী ছাড়াও কতক কামান ও ৪০০ রথ। পালিয়ে গিয়ে ইস্কান্দার খান আশ্রয় নিলেন মানকূট (মানপেট) দুর্গে। তার পিছু নেয়ার জন্য এক খণ্ড-বাহিনীসহ শাহ আবুল ময়ালীকে পাঠানো হল। হুমায়ুন নিজে এগিয়ে গেলেন রাজধানী দিল্লীর দিকে। পাঠালেন এছাড়া বিভিন্ন স্থানে তার বিভিন্ন পদস্থ কর্মচারীদের। আগ্রায় গেলেন উজবেগ ইস্কান্দার খান, অন্যান্যরা ফিরুজ শাহ সম্বল, বয়ান, করউইচ প্রভৃতি অঞ্চলে। সর্বত্র যুদ্ধ চলল।

আমি যখন লাহোর এলাম, সেখানকার শাসনকর্তা মীর্জা শাহ তো কিছুতেই আমাকে পাদশাহের (হুমায়ুন) সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত যেতে দেবেন না। আমার আগমন সংবাদ দিয়ে তার কাছে চিঠি পাঠালেন। সেখান থেকে আদেশ এল অবিলম্বে আমাকে দিল্লী পাঠিয়ে দেয়ার। ইতিমধ্যে একটি মাস বসে বসে নষ্ট হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর তদারকে পাঠানো হল আমাদের দিল্লী। সুলতানপুরের নদীটি নৌকায় চড়ে পার হলাম। তারপর কুড়িদিন পথ চলার পর ফিরুজশাহ হয়ে জুলকদ মাসের শেষ নাগাদ ভারতের রাজধানী দিল্লীতে চরণপাত করলাম। আমরা এসে গেছি শুনে তখুনি পাদশাহ খান-ই-খানান (বৈরাম খান) ও অন্যান্য প্রথম সারির কর্মচারীদের আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য পাঠালেন। সঙ্গে ৪০০ হাতী ও কয়েক হাজার লোক। আমাদের সুমহান পাদশাহর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রকাশ রূপে অপূর্ব সংবর্ধনা জানানো হল আমাদের। সেদিনই আমাদের সম্মানে খান-ই-খানান এক বিরাট ভূরিভোজের আয়োজন করলেন। চলে আসা প্রথানুযায়ী ভারতে 'দর্শন'দান কাল হল সন্ধ্যাবেলা। রাতে প্রচুর জাঁকজমক সমারোহের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে রাজদরবার মহাকক্ষে। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর সম্রাটকে সামান্য কিছু উপহার দিলাম আমি। দিলাম ঐ সঙ্গে তার ভারত জয়ের বর্ণমালা ভিত্তিক একটি কালবিবরণী ও দুটি গজলও উপহার তাকে। পাদশাহ খুব খুশী হলেন এগুলি পেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার যাত্রা আরম্ভের অনুমতি দানের জন্য আবেদন জানালাম। কিন্তু মঞ্জুর করা হল না তা। উল্টে, যাচা হল আমাকে এক কোটি (মুদ্রা) সহ খরচ পরগণার শাসনকর্তার পদ। তা প্রত্যাখ্যান ক'রে আবার আমি যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। উত্তরে শুধু তিনি বললেন অন্ততঃ একটি বছর এখানে থাকতেই হচ্ছে আপনাকে। আমি

জানালাম, আমার সুমহান পাদশাহের বিশেষ নির্দেশে হতভাগা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সাগর পথে বার হয়েছিলাম। ভয়ঙ্কর ঝড়-বাত্যার কবলে পড়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় ভারত উপকূলে এসে পড়েছি। এখন আমার একমাত্র কর্তব্য হল পাদশাহের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে সবিস্তারে সবকিছু জানানো। আর, অল্পকালের মধ্যেই গুজরাটকে কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত করা হবে এরূপ আশা করা।" একথা শুনে ভ্রমণ-কষ্টের হাত থেকে আমাকে অব্যাহতিদানের জন্য কনস্তান্তিনোপলে দূত পাঠাবার প্রস্তাব করলেন হুমায়ূন। কিন্তু আমার পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব হল না। কেন না, এর ফলে এরূপ এক ধারণার সৃষ্টি হবে যে আমি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই এ ধরনের ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছি। তাই আমাকে চলে যেতে দেয়ার জন্যই ক্রমাগত অনুনয় ক'রে চললাম এবং তিনিও সম্মতি দিলেন শেষ পর্যন্ত। তবে সঙ্গে সঙ্গেই নয়। বললেনঃ বাদল ঋতু এসে গেল বলে। এক নাগাড়ে তিনমাস ঝড়-বৃষ্টি চলবে। রাস্তা-ঘাট ডুবে এমন হবে যে পথ চলার উপায়ই থাকবে না। অতএব আবহাওয়া অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত থেকে যান এখানে। ততদিন বরং সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের দিনক্ষণ এবং কোন্‌দিন তারা কত ডিগ্রীতে থাকবে তারই একটি পঞ্জিকা তৈরী ক'রে ফেলুন। আমাদের জ্যোতিষীদের সূর্যের গতি পর্যবেক্ষণে সাহায্য করুন। বিষুবরেখার সংস্থান ও তা নিরূপণের পদ্ধতি বিষয়ে তাদের শিক্ষাদান করুন। এ কাজ শেষ হয়ে গেলে ও আবহাওয়া অনুকূল হয়ে এলে যাত্রা করবেন।

"স্থির সিদ্ধান্তের ভঙ্গীতে ভাবগম্ভীর সুরে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন তিনি। এরপর ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। এতটুকু বিশ্রাম না নিয়ে দিন-রাত পরিশ্রম ক'রে চললাম। জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণাদি সমাধা হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। এদিকে প্রায় এই একই কালে আগ্রাও

পাদশাহের দখলে এল। সাথে সাথে এই ঘটনার বর্ণমালা-ভিত্তিক একটি কালপঞ্জী রচনা ক'রে উপহার দিলাম পাদিশাহকে। যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করল সেটি। একদিন দর্শন অনুষ্ঠান চলা-কালে কথায় কথায় বুক্কুরের সুলতান মাহমুদের প্রসঙ্গ উঠল। তার সাথে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি করার প্রস্তাব দিলাম আমি। হুমায়ুন সম্মতি দিলেন তাতে। দলিল প্রস্তুত হল। জাফরানে হাত ডুবিয়ে সম্রাট সেই কাগজের ওপর পাঞ্জার ছাপ এঁকে দিলেন। পাঞ্জার এই ছাপই হল তুঘরা বা রাজ-স্বাক্ষর। এরপর দলিলটি সুলতান মাহমুদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হল।

"এখানে উল্লেখযোগ্য যে মধ্য-এসিয়ার তুর্কী শাসকেরা এ জাতীয় দলিলে পাঞ্জার ছাপ দিতেন রক্তে হাত ডুবিয়ে। এজন্য তাকে বলা হত অল-তমগ বা লাল ছাপ। বাবরের বংশধরেরাই প্রথমে ভারতে হলুদ রঙা জাফরান দিয়ে পাঞ্জা আঁকার রীতি চালু করেন।

"সুলতান (মাহমুদ) খুব খুসী হলেন এই দলিল পেয়ে। তিনি ও তার ওয়জীর মোল্লা গারী আমার এই মধ্যস্থতার জন্য ব্যক্তিগত পত্র লিখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন আমাকে। সম্রাটকে সে পত্র দেখালাম আমি। এই দলিল পাঠানোর দায়িত্ব তিনি আমার ওপরেই অর্পণ করেছিলেন।

"এই বিশেষ ঘটনাটি আমাকে একটি গজল রচনার বিষযবস্তু যুগিয়ে দিল। সম্রাট সেটি পড়ে এত উচ্ছ্বসিত হলেন যে আমাকে দ্বিতীয় মীর আলী শের বলে অভিনন্দিত করলেন (ইনি মধ্য-এসিয়ার তুর্কীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। খন্দমীরের বিবরণ অনুসারে ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে তার জন্ম হয় ও ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান)। আমি সবিনয়ে এই বিশেষণ অস্বীকার করলাম। বললাম: এ ধরনের প্রশংসা মাথা পেতে নেয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। বরং তাকে অনুসরণ ক'রে যদি কিছু কিছু জ্ঞান-কণিকা

হাসিল করতে পারি তাহলেই নিজেকে আমি ধন্য মনে করব। তা শুনে সম্রাট মন্তব্য করলেন ঃ যদি নিটোলতায় পেঁাছবার জন্য মাত্র একটি বছর সাধনা ক'রে চলেন তাহলেই আপনি মীর শের আলীর প্রতি জগতাইদের অনুরক্তি পুরোপুরি তাদের মন থেকে মুছে দিতে পারবেন। এক কথায় বললে, হুমায়ূন আমার ওপর উদার ভাবে অনুগ্রহ বর্ষণ ক'রে চললেন। সম্রাটের বিশেষ বিশ্বাসভাজন রাজ-ধনুর্ধর খোশাল নিয়মিত এই আলোচনায় অংশ নিতেন। একদিন তার সাথে আলাপ-আলোচনার ফলে দুটি গজল রচনার বিষয়বস্তু পেয়ে গেলাম। অল্পকালের মধ্যেই এ দুটি সারা ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ ক'রে লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। একই ধরনের সৌভাগ্য অর্জন করলাম অফতবেগী আবদুর রহমান বে-র সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রেও। ইনি সম্রাটের বিশেষ বিশ্বাসী ও প্রিয়ভাজন সভাসদ। ব্যক্তিগত জীবনেও ইনি তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। নিয়মিত কাব্য-প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। তার ওপরেও দুখানি গজল রচনা করলাম আমি।

"এক কথায়, কাব্য আলোচনাই ছিল সেখানকার দৈনন্দিন চলিত রীতি। সর্বদাই সম্রাটের সমুখে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটত আমার। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করে বললেন ঃ তুর্কী ভারতবর্ষের চেয়েও বড় কিনা? আমি উত্তর দিলাম 'তুর্কী বলতে জঁাহাপনা যদি মূল রূম ভূখণ্ড অর্থাৎ সিওয়সের কথা বলে থাকেন (ওসমান বংশীয়দের আদি রাজ্য এলাকা) তাহলে ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে বড়। আর যদি রূমের শাসকের অধীন অঞ্চলগুলি যে এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে তার বিস্তারের কথা বলে থাকেন তাহলে ভারতবর্ষ তার দশমাংশও নয়। হুমায়ূন বললেন ঃ আমি পুরো সাম্রাজ্যের কথা বলছি। 'তাহলে জঁাহাপনা', আমি উত্তর দিলাম, 'আমার তো মনে হয়, ইস্কান্দারের (আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট) সাম্রাজ্য যে সপ্তমণ্ডল জুড়ে ছিল তুর্কীর পাদশাহের বর্তমান

সাম্রাজ্য তার সঙ্গে অভিন্ন। ইতিহাসের পুঁথিতে ইস্কান্দারের জীবনী ও রাজত্বের বিবরণী বর্তমান। কিন্তু এরূপ মনে করা অযৌক্তিক যে তিনি নিজে প্রকৃতই ওই সপ্তমণ্ডলের সর্বত্র গিয়েছিলেন বা সরাসরি নিজে তাকে শাসন করেছিলেন। কেননা, পৃথিবীর মানব অধ্যুষিত এলাকা (সেকালে বর্তমানের এক চতুর্থাংশ মাত্র) ১৮০ ডিগ্রী দেশান্তর জুড়ে, অক্ষাংশও বিষুবরেখা থেকে প্রায় ৬০ ডিগ্রীর মতো। জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় হিসাব অনুযায়ী এ এলাকার পরিসর ১৬, ৬৮, ৬৭০ ফরসাখ। কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এর সমগ্র অঞ্চলে ভ্রমণ কিংবা শাসন একেবারেই অসম্ভব। সম্ভবতঃ এই (সপ্তমণ্ডলা পৃথিবীর) প্রত্যেক মণ্ডলের কিছু কিছু অংশই শুধু যা তার অধিকার মধ্যে ছিল। ঠিক তেমনটি তুর্কীর পাদশাহের বেলায়ও।' 'কিন্তু এর সবকটি মণ্ডলেই কি তুর্কী সম্রাটের অধিকৃত অঞ্চল রয়েছে?'—প্রশ্ন ক'রে বসলেন এবার হুমায়ূন। 'নিশ্চয়ই', আমিও উত্তর দিলাম, 'প্রথম (মণ্ডলে) ইয়ামেন, দ্বিতীয় মক্কা, তৃতীয় মিশর, চতুর্থ অলেপ্পো, পঞ্চম কনস্তান্তিনোপল, ষষ্ঠ কফা আর সপ্তম ওফেন ও ভিয়েনা'।"

এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রয়াস করা সত্ত্বেও তুর্কীরা কখনো ভিয়েনা দখল করতে পারেনি। সুতরাং তুর্কী নৌ-অধ্যক্ষ তার সম্রাটের গৌরব জাহির করতে গিয়ে কিছুটা অসত্য ভাষণের আশ্রয় নিয়েছেন।

"আমি বলে চললামঃ 'তুর্কীর পাদশাহ এর প্রত্যেকটি অঞ্চলেই বেগলার-বেগ ও কাজী নিয়োগ ক'রে থাকেন, তার নামে এরাই সেখানকার শাসনকার্য চালায়। গুজরাটে সওদাগর খাজা বক্সী ও কর হসনের কাছে আরো একটি বিশেষ সংবাদ জানতে পেলাম।' (একমাত্র ভগবানই জানেন এ কাহিনী সত্যি কিনা!) তারা বললেঃ চীনের তুর্কী বণিকরা বৈরাম দিনের (শুক্রবারের) প্রার্থনায় তাদের আপন সম্রাটের নামোল্লেখ করতে চেয়ে চীনের

খাকানের কাছে সেজন্য অনুমতি চেয়ে অনুরোধ জানালো। এই প্রসঙ্গে তারা যুক্তি দর্শালো যে তাদের সম্রাটই মক্কা, মদিনা ও কিবলার (অর্থাৎ যেদিক পানে মুখ করে প্রার্থনা করা হয়) অধীশ্বর, সুতরাং বৈরাম প্রার্থনায় তার নাম উল্লেখের যোগ্য তিনি। খাকান (চীনের সম্রাট) যদিও একজন কাফের, তাহলেও এই অনুরোধের ন্যায়ভিত্তি অনুভব করার মতো অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিলেন তিনি। অবিলম্বে সেজন্য অনুমতি দিলেন। শুধু তা-ই নয়, খত্বিব-কেও (যে মোল্লা খুত্বা বা শুক্রবারের প্রার্থনা পাঠ করেন) তিনি সম্মানসূচক পোশাক উপহার দিলেন ও হাতির পিঠে চড়িয়ে সমগ্র নগরে তাকে ঘোরালেন। সেই থেকে সেখানকার বৈরাম প্রার্থনায় তুর্কীর পাদশাহের নাম যুক্ত হয়েছে। প্রশ্ন করি, 'এরকম সম্মান ইতিপূর্বে কখনো আর কারো ভাগ্যে ঘটেছে কি?' সম্রাট (হুমায়ুন) তখন তার বেগদের পানে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন: 'ঠিক, একমাত্র তুর্কীর শাসকই পাদশাহ বিশেষণ ব্যবহার করার মতো যোগ্য ব্যক্তি। শুধু তিনিই, এছাড়া সমগ্র পৃথিবীর কেউই আর নয়'।

"আরেকবার কথাবার্তা চলছিল আমাদের ক্রিমিয়ার খানের প্রসঙ্গ নিয়ে। আমি মন্তব্য করলাম: তিনিও তুর্কীর পাদশাহের অধীনে আপন পদে রয়েছেন। হুমায়ুন (অবাক সুরে) বললেন 'তা-ই যদি হবে তাহলে কি ক'রে তিনি (নিজ নামে) খুত্বা পাঠের অধিকার পেলেন?' আমি উত্তর দিলাম: এ তো অতি জানা কথা যে আমাদের পাদশাহেরই একমাত্র ক্ষমতা রয়েছে খুত্বা পাঠ ও মুদ্রা তৈরির অধিকার দেয়ার। আমার এই জবাব সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলেন বলেই মনে হল। এরপর সকলে সমবেত ভাবে আমাদের পাদশাহের মঙ্গল কামনা ক'রে প্রার্থনা জানালাম।

"একদিন সম্রাট একটি ছোটখাট প্রমোদ ভ্রমণের আয়োজন করলেন। ঠিক হল, ঘোড়ার পিঠে চেপে লাহোরের পুণ্যশ্লোক

শেইখদের সমাধিগুলি দর্শন করা হবে। আমিও গেলাম তার সঙ্গে। দর্শন করলাম দিল্লীর পীর শাহ কুতবউদ্দীন, শেইখ নিজাম ওয়ালী, শেইখ ফরিদ শকর ঘঞ্জ, মীর খসরু দিহলভী (দিল্লীবাসী) ও মীর হুসেন দিহলভী প্রভৃতির সমাধি। আমাদের কথাবার্তা এক সময়ে বাঁক নিল মীর খসরুর কাব্যকৃতি আলোচনায়। আমি তার সেরা কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি আবৃত্তি ক'রে চললাম। এবং তারই ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে মনে অতি বাঙ্ময় দুই চরণের একটি শ্লোক রচনা করে ফেললাম। আবেগভরে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বললাম মীর খসরুর কাব্য প্রতিভার সাথে আপন ক্ষমতার তুলনা করতে যাওয়া নিঃসন্দেহে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। তবুও তার কাব্যকৃতি আমায় উদ্দীপিত করে তুলেছে। যদি অনুমতি করেন, তাহলে আমার রচনা করা একটি দুই চরণের শ্লোক জাঁহাপনাকে শোনাতে চাই। হুমায়ুন তা শুনে বললেন. বেশ তো বলুন না, শোনা যাক্। আমি আবৃত্তি করলাম ঃ

মহান তিনিই সত্যিকারের তৃপ্ত যে জন অন্নটুকুই পেলে সকল রাজার চেয়েও সুখী অল্পে খুশী বলে।

"শুনে সম্রাট মুগ্ধ কণ্ঠে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন ঃ বাঃ! সত্যিই অতি চমৎকার!

"এখানে আপন কাব্যিক ভাবোচ্ছ্বাস জাহির করা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। হুমায়ূনের কাব্য উপলব্ধি ক্ষমতাকে তুলে ধরাই বরং এর লক্ষ্য।

"এবার একদিন রাজকীয় সীল রক্ষক শহীন বে-র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অনুরোধ জানালাম আমাকে যাত্রার অনুমতি পাইয়ে দেয়ার জন্য একটুখানি তার প্রভাব খাটাতে। একেবারে শূন্য হাতে যাওয়া সুশোভন হবে না ভেবে দুটি গজল নিয়ে গিয়েছিলাম তাকে উপহার দেয়ার জন্য। শহীন বে তার সাধ্য

মতো চেষ্টা করবেন বলে কথা দিলেন। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই একদিন খোশ-খবর শোনালেন। বললেনঃ আপনার আবেদন মঞ্জুর করেছেন সম্রাট। তবে, তিনি আশা করেছেন আপনি আপনার আবেদনটি আনুষ্ঠানিক ভাবে কবিতায় পেশ করবেন। বর্ষা ঋতু শেষ হবার মুখে তখন। লিখলাম সম্রাটের কাছে। সঙ্গে দুটি গজলও জুড়ে দিলাম। মনোবাঞ্ছা পূরণ হল। শুধু যে যাবার অনুমতিই পেলাম তা নয়, দিলেন নানা উপহার। দিলেন নিরাপত্তা সূচক অভয়-পত্রও।

"যাবার জন্য সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। সেদিন শুক্রবার। সন্ধ্যাবেলায় 'দর্শন' দিলেন হুমায়ুন। তারপর প্রমোদ দুর্গ ত্যাগ করার জন্য উঠলেন। ঠিক যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন এমন সময় মুয়জ্জিন আজানের ধ্বনি দিলেন। এরূপ ধ্বনি শোনা মাত্র পরমের উদ্দেশ্যে নতজানু হওয়া তার এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এসময়েও তাই করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ (ভারসাম্য না রাখতে পেরে) কয়েক ধাপ গড়িয়ে নিচে পড়ে গিয়ে মাথা ও হাতে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। প্রবাদ বাক্য একেবারে খাঁটি কথাই বলেছে 'ভাগ্যের মার, দুনিয়ার বার।'

"প্রাসাদের সর্বত্র এর ফলে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। দুদিন যাবৎ এ দুর্ঘটনার খবর তারা গোপন রাখলেন। বাইরে সকলের কাছে বলা হল সম্রাট বহাল তবিয়তে রয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় দিনে, অর্থাৎ সোমবারে সেই আঘাতজনিত ক্ষতের ফলে মারা গেলেন তিনি। কোরানের কথাই যেন সত্য হয়! 'আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসি, ফিরে যাই আবার তারই কাছে।'

"তার পুত্র জলালউদ্দীন আকবর তখন কাছে নেই। খান-ই-খানান (বৈরাম খান)-কে সঙ্গে নিয়ে গেছেন তিনি শাহ আবুলময়ালীর সাথে দেখা করার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এই দুঃসংবাদ জানানোর ব্যবস্থা নেয়া হল। চরম আতঙ্ক ও বিহ্বলতা খেলে

গেল খান আর সুলতানদের মধ্যে, কি যে তারা করবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। তাদের মনে সাহস সঞ্চারের জন্য আমি চেষ্টা ক'রে চললাম। শোনালাম, সুলতান সলীমের মৃত্যুর পর পীরি পাশা তার প্রজ্ঞাবলে কিভাবে তখনকার সেই পরিস্থিতিকে সামলেছিলেন। কিভাবে তিনি সেই মৃত্যুর খবর যাতে বাইরের জগতে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা করেন। প্রস্তাব দিলাম ঃ চাইলে তারাও ঠিক একই পদক্ষেপ নিয়ে পাদশাহজাদা ফিরে আসা পর্যন্ত সম্রাটের মৃত্যুর খবর গোপন রাখতে পারেন। এই পরামর্শই গ্রহণ করলেন তারা। দীওয়ান স্বাভাবিক ভাবে দৈনন্দিন কাজকর্ম ক'রে গেলেন, অভিজাতদের যথারীতি আহ্বান ও তাদের আনাগোনা চলতে থাকল। সাধারণ্যে ঘোষণা করা হল সম্রাট তার মূল রাজ্য পরিদর্শনে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন। ঘোড়ায় চড়ে সেখানে যাবেন তিনি ; পরে আবাব ঘোষণা ক'রে জানিয়ে দেয়া হল ঃ প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন যাত্রা বাতিল করলেন তিনি। পরের দিন আম-দরবার বসার কথা ঘোষণা করা হল। কিন্তু সময় দরবার বসার পক্ষে শুভ নয় বলে জ্যোতিষীরা মত দেয়ার দরুন স্থগিত রাখা হল তা। এসব ঘটনা সেনাবাহিনীর ভেতরে কিছুটা সন্দেহ ও চাঞ্চল্যের ভাব সৃষ্টি করল। তা লক্ষ্য ক'রে মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত নেয়া হল, এ সময় সম্রাটের পক্ষে সৈন্যদের একবার দর্শন দেয়া বাঞ্ছনীয়। প্রয়াত সম্রাটের সঙ্গে মোল্লা বী নামের এক ব্যক্তির লক্ষ্যণীয় সাদৃশ্য ছিল। শুধু যা আকৃতিতে সামান্য খাটো। তাকে সম্রাটের বেশভূষা পরিয়ে সুপ্রশস্ত বহির্মহাকক্ষে এজন্য বিশেষ ভাবে স্থাপিত এক সিংহাসনে এনে বসিয়ে দেয়া হল। তার চোখ ও মুখ কাপড় ঘেরের আড়ালে প্রচ্ছন্ন। রাজ-পার্শ্বচর খোশল বে তার পিছনে দাঁড়িয়ে। প্রথম সচিব তার সুমুখে। চলেছে উৎসবের পরিবেশ রচনাকারী সুমধুর যন্ত্র-সঙ্গীত। তারই মাঝে বহু পদস্থ রাজ-

কর্মচারী, অভিজাত ও নদীকূলের লোকেরা সম্রাটকে দর্শন ক'রে সানন্দে অভিবাদন জানিয়ে যেতে থাকলেন। চিকিৎসকদের প্রচুর পুরস্কার দেয়া হল। সম্রাটকে আরোগ্য ক'রে তোলার কৃতিত্বের জন্য সকলে তাদের প্রশংসা করলেন।

"সব সভাসদদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমি। সম্রাটের আরোগ্যের সংবাদ বহন ক'রে রবিউল আওয়াল মাসের মাঝামাঝি নাগাদ লাহোর পেঁছিলাম। দিনটি বৃহস্পতিবার। সনিপত, পানিপত, কিরনত, তানিসের ও সমানি (শোনপত, পানিপত, করনাল, থানেশ্বর ও সমানি)-তে থামলাম পথে। সেখানকার শাসনকর্তাদের সংবাদ দিলাম যে সম্রাট এখন দর্শন দিচ্ছেন, সুস্থ শরীরে রয়েছেন। সেখান থেকে শহরন্দের (শিরহিন্দ) সড়ক ধরে গেলাম মাচুওয়ারা (মাছিওয়ারা, পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়) এবং বাচুওয়ারা। তারপর সুলতানপুর পেঁছে সেখানকার নদীটি (শতদ্রু) নৌকায় পার হয়ে এলাম লাহোর। ইতিমধ্যে মীর্জা জলালউদ্দীন আকবর সিংহাসনে বসলেন। লাহোর ও অনেক স্থানে শুক্রবারের প্রার্থনায় তার নাম যোগ করা হল।

"লাহোরের শাসনকর্তা মীর্জা শাহ তো কিছুতেই আমাকে যেতে দেবেন না। বললেন, নতুন সম্রাটের কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে, কোন ব্যক্তিকেই যেন কাবুল ও কন্দহার যাবার অনুমতি দেয়া না হয়। এখন একমাত্র পথ খোলা রয়েছে সম্রাটের (আকবর) কাছে ফিরে যাওয়া। তাই চললাম। কেলনোর (কলানৌর) পর্যন্ত এগোবার পর সেখানেই জলালউদ্দীন আকবর ও খান-ই-খানান এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে গেল। ঠিক মানকোট দুর্গের বিপরীত দিকে।

"(খান-ই- খানান) বৈরাম খানের খোজা মোল্লা পীর মহম্মদকে দিয়ে খবর পাঠানো হল আমি যেন বর্তমানে যেখানে আছি সেখানেই থাকি। অল্পকালের ভেতর সিন্দ অথবা হিন্দ যেখানে

আমার পছন্দ কোন না কোন পদে নিয়োগ করা হবে আমাকে। তখন ছুটলাম তাড়াতাড়ি প্রয়াত সম্রাটের দেয়া ফরমান দর্শাতে। ঐ সঙ্গে তার পিতার মৃত্যুর ওপরে একটি বর্ণমালা ভিত্তিক কালপঞ্জী রচনা ক'রে তা উপহার দিলাম তাকে। মীর্জা (সম্রাট) খুসী হলেন গাথাটি পেয়ে। পিতার দেয়া ফরমানটি খুঁটিয়ে দেখে যাত্রা শুরু করার অনুমতি দিলেন। তবে শর্ত রাখা হল, যে চারজন বেগকে তিনি বর্তমানে সৈন্যসহ কাবুল পাঠাতে চলেছেন তাদের সঙ্গে যেতে হবে।

"আবুল ময়ালীকে ইতিমধ্যে বন্দী ক'রে লাহোর দুর্গে এনে রাখা হয়েছে।"

ইনি কাশনগরের সঈদ। ১৫৫১-তে হুমায়ূনের অধীনে চাকুরি নেন। আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে এ সময়ে কাবুল দখল করেন। সেখানে তাকে পরাজিত ও বন্দী ক'রে লাহোর দুর্গে এনে আটক রাখা হয়। ১৫৬৩-তে তিনি মারা যান।

"গাথাটির প্রতিদানে পথ খরচ স্বরূপ এক লক্ষ (মুদ্রা) দেয়া হল আমাকে। চারজন বেগের সঙ্গে যাত্রার জন্য আয়োজন ক'রে চললাম।

"ভারতে বহু নতুন ও বিস্ময়কর বস্তু দেখার সুযোগ ঘটেছে আমার। তার মধ্যে গুটি কয়েকের উল্লেখ এখানে প্রয়োজন মনে করি। (স্থানীয়) বিধর্মীদের গুজরাটে বলা হয় 'বেণিয়া' ও ভারতে 'হিন্দু'। এরা অহলি কিতাবের (অর্থাৎ কোরান প্রমুখ চার মুসলিম ধর্মপুস্তকের) অনুশাসন মেনে চলে না, এবং ভাগ্যবাদী। কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার দেহ নদীকূলে দাহ করা হয়ে থাকে। যদি মৃত ব্যক্তির কোন স্ত্রী থাকে এবং সে সন্তান ধারণের বয়স পার হয়ে থাকে তবে আর তাকে পোড়ানো হয় না। কিন্তু সন্তান ধারণের বয়স পার না হয়ে থাকলে তাকে কোনরূপ রেহাই না দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। যদি কারো স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমরণে

যেতে চায় তবে আত্মীয় স্বজনেরা মহা ধূমধামের সঙ্গে সেই অনুষ্ঠান পালন করে। যদি মুসলমানেরা জোর ক'রে এই আত্ম-বলিদানে বাধা দেয় তবে ভাগ্যের বিধান অনুযায়ী রাজাকে প্রাণ হারাতে হয় ও তার বংশ নির্মূল হয়ে যায়। এজন্য, এরূপ ঘটনাকালে যাতে কোনরূপ বাধা বা গোলমালের সৃষ্টি না হয় তা দেখার জন্য সর্বদা প্রতিটি অনুষ্ঠানে পাদশাহের পদস্থ কর্মচারীরা উপস্থিত থাকেন।

"আরেকটি অভূতপূর্ব প্রথা হল পোষা হরিণ (gazelle) দিয়ে শিকার করানো। তার বহুশাখ শৃঙ্গে আলগা ভাবে একটি জাল জড়িয়ে দিয়ে বুনো হরিণদের সঙ্গে মেশার জন্য (অরণ্যে) ছেড়ে দেয়া হয়। সদৃশের প্রতি সদৃশ আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং বুনো হরিণরা অল্পকালের মধ্যেই পোষা হরিণদের সঙ্গে ভাব জমাতে আসে। একের মাথার কাছে অন্যের মাথা এগিয়ে দেয়। ফলে পোষা হরিণের শৃঙ্গে জড়িয়ে দেয়া জালের ফাঁদটি বুনো হরিণের শৃঙ্গে জড়িয়ে যায়। তখন সে তা ছাড়াবার জন্য টানাটানি শুরু করে। কিন্তু যত টানাটানি করে ততো বেশি ক'রে সে তাতে জড়িয়ে পড়ে, পালাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের সর্বত্র এই কৌশলটির প্রয়োগ করা হয়। (এ সম্পর্কে নিখুঁত বিবরণের জন্য আইন-ই-আকবরী দেখুন।)

"তৃণাঞ্চলে অগুণতি মহিষ। হাতির পিঠে চড়ে তাদের শিকার করা (বা ধরা) হয়। এজন্য হাতির পিঠের ওপর একটি গম্বুজ মতো স্থাপন ক'রে তার ভেতর জনা কয়েক শিকারী লুকিয়ে থাকে। এভাবে তৃণাঞ্চলের সমতল বুকে এগিয়ে চলে তারা। যেই মহিষের দেখা পায় হাতিটি তার দাঁত দিয়ে তাকে আক্রমণ করে এবং যতক্ষণ না শিকারীরা পিঠের ওপর থেকে নেমে আসে ও বন্দী করে ততক্ষণ দাঁত দিয়ে চেপে ধরে রাখে। এই একই উপায়ে বুনো ষাঁড় (গউ-কুটাস)-ও শিকার করা হয়। তবে, সমগোত্রীয় অন্যান্য

প্রাণীর তুলনায় এরা বেশি শক্তিশালী। জিহ্বায় তারা এত জোর ধরে বলে মনে করা হয় যে তা দিয়ে মানুষকে পর্যন্ত মেরে ফেলতে পারে তারা। সম্রাট হুমায়ুন নিজে একদিন এ সম্পর্কে একটি কাহিনী বলেন আমায়। একটি ষাঁড় একজন মানুষকে কাবু ক'রে ফেলে জিভ দিয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছাল ছাড়িয়ে দেয়। কাহিনীটি যে সম্পূর্ণ সত্য সে সম্পর্কে সম্রাট দিব্বি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন। সব চেয়ে ভালো জাতের কুটাস মেলে বহর-আইচ (অবধের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। ফৈজাবাদ থেকে ৭০ মাইল দূরে ২৭°৫´ অক্ষাংশে ও ৮২° দেশান্তরে অবস্থিত) এলাকায়। সম্ভবতঃ এই কারণ থেকেই তারা স্থলচর হওয়া সত্ত্বেও তাদের বহরী-কুটাস (এর আক্ষরিক অর্থ সাগর-কুটাস বা সাগর ষাঁড়) বলা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ এরকম অভূতপূর্ব ও অধিকতর আকর্ষণীয় আরো অনেক বিষয়ের কথা বলে চলা যেতে পারে—কিন্তু তাতে বহু সময় লেগে যাবে।

"রবিউল আওয়ালের মাঝামাঝি আমরা কাবুল রওনা হলাম। লাহোর নদীটি (রাবি বা ইরাবতী) পার হলাম জাহাজে চেপে। তারপর এসে গেলাম আরো একটি বড় নদীর কূলে (সম্ভবতঃ দেঘ নদী)। পার হলাম সেটিও। কাছাকাছি কোন জাহাজের দেখা না পেয়ে পিপে আর চৌকি দিয়ে একটি ভেলা বানিয়ে ফেললাম আমরা, তাতে চেপেই সকলে ওপারে পৌঁছলাম। এলাম এরপর বহর-এ। এখানে আরো একটি নদী পার হতে হল (চেনাব বা চন্দ্রভাগা), তবে এবার জাহাজে ক'রেই। এখানকার শাসনকর্তাকে যখন আকবরের আদেশের কথা শোনালাম, তিনি উত্তর দিলেন, হায় ভগবান! পাদশাহের মৃত্যুর দরুন এখন পর্যন্ত একেবারেই কর আদায় করিনি আমরা, লোকের কাছে পাওনা রয়ে গেছে সব। ঠিক আছে, চারিদিকে লোক পাঠাচ্ছি, আদায় করে অর্থ নিয়ে এলে আপনাকে দিয়ে দেব।"

এই বর্ণনা থেকে আভাস মেলে যে সম্রাট আকবর সীদী আলী রঈসকে যে লক্ষ মুদ্রা উপহার দিয়েছিলেন তা নগদ আকারে দেননি। দিয়েছিলেন চিঠা বা ফরমানের আকারে। পথে এক বা একাধিক জেলা-প্রধানের কাছ থেকে তা সংগ্রহ ক'রে নেয়ার শর্তে।

"মীর বাবু ও সঙ্গের অন্যান্য বেগেরা পরামর্শ করতে বসলেন। এদিকে শাহ আবুলময়ালী লাহোর (দুর্গ) থেকে পালিয়েছেন। হয়তো কাবুলে ভাই কিয়মর্দ খানের কাছেই আশ্রয় নিয়েছেন এসে। এক্ষেত্রে পথে দেরি করা একেবারেই উচিত হবে না। সুতরাং তারা প্রস্তাব দিলেন, যতদিন না কর আদায় হয়ে আসে, অর্থ না মেলে আপনি এখানেই থেকে যান, তারপর যত তাড়াতাড়ি পারবেন আমাদের পিছু নেবেন।

"আমি যুক্তি দর্শালাম ঃ পথঘাট নিরাপদ নয়, বিপদ সর্বক্ষণ ওৎ পেতে রয়েছে, এ অবস্থায় সকলে একত্র যাওয়াই সব থেকে ভাল। 'নির্লোভে শান্তি, লোভে অশান্তি' এই আপ্তবাক্যটি স্মরণ ক'রে সেই মতো কাজ করলাম আমি। অর্থের ওপর দাবি ছেড়ে দিয়ে তাদেরই সঙ্গ নিলাম। খোশ-আব ও নীল-আব নদী জাহাজে পার হয়ে পদার্পণ করলাম বখ্‌তর উপকূলে।

।। নয় ।।

"জমাজিউল অওয়াল মাসের আরম্ভকালে নীল-আব পার হলাম আমরা। এবার বাঁক নিয়ে চলতে শুরু করলাম কাবুল (শহরের) দিকে। আদম খানের অধীন আফগানদের বাস-এলাকার মধ্য দিয়ে পথ। কখন তারা কী ক'রে বসে এই ত্রাসে তাড়াতাড়ি সে অঞ্চল পার হবার জন্য সারা রাত ধরে এগিয়ে চললাম। দিনের আলো যখন ফুটল তখন সকলে পাহাড়ের পাদদেশে। এ পর্যন্ত আমাদের ওপর চোখ পড়েনি ওদের। কিন্তু পাহাড় চূড়ায় যখন পেঁছিলাম তখন হাজার হাজার সংখ্যায় জড়ো হয়ে গেল। হাতে বন্দুক তুলে নিলাম সকলে। তারই দৌলতে ও ঈশ্বরের করুণায় তাদের কবল থেকে নির্বিবাদে বেরিয়ে এলাম। পা রাখলাম শেষ অবধি পেশোয়ার শহরে। এর পর কিছু দূর এগিয়ে পার হলাম খাইবার গিরিপথ, এলাম জুশাই (জুইশাহী)-তে। পাহাড় এলাকায় দুটি গণ্ডার দেখার সুযোগ হল আমাদের। আকারে সে দুটি ছোট হাতির সমান। নাকের ওপরে দু ইঞ্চি মতো লম্বা একটি শিঙ (খড়্গ) রয়েছে। আবিসিনিয়ায় এই প্রাণীটি প্রচুর সংখ্যায় বর্তমান।

"এবার এলাম আমরা লঘমন। তারপর এগিয়ে চললাম হজারাদের (পর্বত সংকুল) বাসভূমির মধ্য দিয়ে। যেমন দুরূহ তেমনি অতি পরিশ্রম সাধ্য পথ পরিক্রমা। অবশেষে পেঁছিলাম এসে কাবুলিস্তান, তার রাজধানী কাবুল।

"দেখা করলাম হুমায়ুনের (অপর) দুই পুত্র মহম্মদ হকীম মীর্জা ও ফারুক ফাল মীর্জার সঙ্গে। দেখা হল মুনিম খানের সাথেও। হুমায়ুনের ফরমান পেশ করার পর অতি সমাদর দেখালেন আমায়। কাবুল সত্যিই এক রূপসী নগরী। সুশুভ্র

তুষার ঢাকা পাহাড়মালা দিয়ে ঘেরা দুরন্ত নদীর কোলে অসংখ্য প্রমোদউদ্যান। যেদিকে তাকাও প্রমোদ বিলাস, হই-চই আনন্দের দৃশ্য। ভোজ আর ভূরি ভোজনের অনুষ্ঠানই সেখানকার আধুনিক জীবন-যাত্রার এক প্রধান অঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রত্যেক আনাচে কানাচে উজ্জ্বল পোশাক পরা তন্বী লুলীরা মন ভোলানো গান বাজনার চুম্বকী আকর্ষণের সাহায্যে তাকে ঘিরে জমায়েত উচ্ছল জনতার দলে যোগ দেয়ার জন্য পথিকদের হাতছানি দিয়ে চলেছে। অধিবাসীদের পানে তাকালে মনে হবে হইচই আনন্দ উপভোগ ছাড়া আর কোন কিছুর জন্যই যেন তাদের কোনরকম ভাবনা কিংবা গরজ নেই। (যাযাবর বা জিপসীদের মধ্য এসিয়ায় লুলী বলা হয়।)

"ভাগ্যের দৌলতে একবার যে কাবুলের লুলীদের মাঝে এসে গেছে কোন দুঃখে সে আর স্বর্গে যাবার ও হুরীদের সঙ্গ লাভের স্বপ্ন দেখবে ?

"আমাদের অবশ্য সে ধরনের চপলতা দেখাবার সময় কিংবা মেজাজ কোনটাই ছিল না। তখন আমাদের একমাত্র চিন্তা কি ক'রে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাব। মুনিম খান জানালেন পথঘাট এখন তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে, হিন্দু-কোহ পার হওয়া এখন প্রায় দুঃসাধ্য। সে চেষ্টা করার চেয়ে কাবুলে কিছুটা দিন কাটিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শুনে উত্তর দিলাম, মনে সংকল্প থাকলে পাহাড় মানুষের কাছে কোন বাধা নয়। ফরাসী ও পেশীর প্রশাসক মীর নজরীকে তখন আমাদের সঙ্গী হবার জন্য নির্দেশ দিলেন শাসনকর্তা (মুনিম খান)। আমাদের ঘোড়া ও সামগ্রীসম্ভার নিরাপদে গিরিপথের ওপারে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও তারই লোকজনের ওপর দেয়া হল। সুতরাং, জমাজিউল অওয়াল মাসের প্রথম দিকেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এলাম কর-বাগ-এ। সেখান থেকে তহরিকর। তারপর পরভান বা মরভান।

"এ অঞ্চলটি নজরীর জন্মস্থান। এখানে তিনি তার লোকজন সংগ্রহ করে নিলেন। তারাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিরাপদে পাহাড়ের অপর প্রান্তে পেঁছে দিল। অতি দুর্গম এই পথ। কিন্তু সেদিনের মধ্যেই তা অতিক্রম করলাম আমরা। গিরিপথটির পাদদেশে বর্তমান একটি গ্রামে রাতটি কাটিয়ে দিলাম।"

॥ দশ ॥

"অনদরাব শহরে এসে গেলাম আমরা। রজব মাসের শুরু হয়েছে তখন সবে। তারপর সেখান থেকে বদকশানের পথ ধরে এগিয়ে চললাম তলিকান যাবার উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে দেখা করলাম (বাবরের জেঠতুতো ভাই 'জ্ঞানী' মীর্জা খানের পুত্র) সুলেইমান শাহ ও তার ছেলে মীর্জা ইব্রাহীমের সঙ্গে। পৌঁছবার দিনই মীর্জা (ইব্রাহীম) তার প্রমোদ উদ্যানে দেখা করলেন আমার সাথে। কতক সামগ্রী সহ একটি গজল উপহার দিলাম তাকে। কবিতার ওপর দখল রয়েছে মীর্জার। সুতরাং আমার সঙ্গে কবিতার প্রতিযোগিতা শুরু ক'রে দিলেন। পরের দিন পরিচয় করিয়ে দিলেন তার পিতার সাথে। তাকেও অন্যান্য কতক সামগ্রী সহ একটি গজল উপহার দিলাম। সুলতানও আমাকে যথেষ্ট সমাদর দেখালেন, অবারিত অনুগ্রহ বর্ষণ করলেন। বালখের শাসক পীর মহম্মদ খান ও তূরানের শাসক বোরক খানের মধ্যে তখন সংঘর্ষ চলেছে। পথঘাট মোটেই নিরাপদ নয়। তার ওপর পীর মহম্মদের ছোট ভাই আবার কুন্দুজ, কবাদিয়ান ও তিরমিদ-এ বিদ্রোহের পতাকা তুলেছে। সেখানকার অবস্থাও রীতিমতো গোলমেলে এখন। তাই, বদকশান হয়ে খুটলানের পথ ধরে ভ্রমণ করার পরামর্শ দিলেন তারা। সুলেইমান ও তার ছেলে দুজনেই আমাকে ঘোড়া, সম্মানী পোশাক উপহার দিলেন। খুটলানের অধিপতি জহাঙ্গীর আলীর কাছে দিলেন একটি সুপারিশ পত্র লিখেও। তিনি সুলতানের ছোট বোনকে বিয়ে করেছেন। অতএব, বদকশানের রাজধানী খিজম যাবার জন্য এবার রওনা হলাম (সুলেইমান শাহ এখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন)।

সেখানে পৌঁছে দর্শন করলাম সুলতানের প্রমোদ উদ্যান ও হুমায়ূনের তৈরি দোয়াব বাগ। এগিয়ে চললাম তারপর কেল্লা-ই-জফর (বিজয়দুর্গ) হয়ে রাসটকের পানে। তারপর সেখান থেকে বন্দর সেমতি। এরপর কাশগড়ের পাশ ঘেঁষে চললাম খুটলানের দল্লিতে। তীর্থ করলাম সেখানে পৌঁছে সঈদ আলী হমদানীর সমাধিতে। এগিয়ে চললাম তীর্থ সেরে কুলাবা (আধুনিক কুলাব, সাগর পৃষ্ঠ থেকে ১৮১০ ফুট উঁচুতে, অক্সাস বা ইক্ষু নদীকূলে)। সেখানে পৌঁছে দেখা করলাম জহাঙ্গীর আলী খানের সাথে। সুপারিশ পত্রখানি পেশ করলে নিরাপদে আমাকে চরসুই পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য ৫০ জনের এক রক্ষী বাহিনীকে সঙ্গে দিলেন। পেঁাছলাম সেখানে। পার হলাম পুল-ই-সনঘিন বা পাথরের সেতু। বিদায় দিলাম রক্ষীবাহিনীকে।"

॥ এগারো ॥

"সেতুটি যেদিন পার হলাম, সেদিনই পদার্পণ করলাম তূরানে। একটি দিন বিশ্রাম নিয়ে যাত্রা করলাম বাজার নো (নতুন বাজার) অভিমুখে। সেখান থেকে গেলাম একটি ছোট গঞ্জে। নাম চিহরশম্ব। দর্শন করলাম খাজা য়াকুব চরখীর সমাধি। রওনা হলাম তারপর চঘনীয়ান, অর্থাৎ হিসার-ই-শাদমানের উদ্দেশ্যে (ঈলাক ও খান-কা-দরিয়ার সঙ্গমস্থলে হিসার। পূর্বে এ অঞ্চল পরিচিত ছিল হিসার-শাদমান নামে)। দেখা করলাম উজবেগ শাসকদের কগল্‌গ বা প্রধান তৈমূর সুলতানের সঙ্গে। তারপর অতিক্রম করলাম সনঘিরদিক পর্বত। সব সময় বর্ষা হয়ে চলেছে এখানে। ফলে পাহাড়ের পাদদেশে বেশ বড়সড় এক নদী প্রবাহ জন্ম নিয়েছে। ঈশ্বরের এই বিস্ময়কর লীলা আমাকে অভিভূত ক'রে তুলল। এরপর উপস্থিত হলাম শহর-ই-সবজ বা কেশ-এ। দেখা করলাম হাশিম সুলতানের সঙ্গে। অনুমতি দিলেন তিনি সমরকন্দ যাবার। চরম কষ্ট সয়ে পার হলাম এ দুই অঞ্চল মধ্যে প্রাচীর রূপে খাড়া পর্বতটিকে (করতেপে মাউণ্ট বা কালো পাহাড়)। থামলাম এসে একটি ছোট্ট শহর মজর-এ।

শব্বান মাসের আরম্ভে পেঁছিলাম এসে সমরকন্দ। দর্শন করলাম এক নিখুঁত স্বর্গপুরী। সাক্ষাৎ করলাম বোরক খানের সাথে (মাহমুদ খানের পুত্র নোরুজ আহমদ)। আমার সামান্য উপহারের প্রতিদানে তিনি দিলেন আমাকে একটি ঘোড়া ও সম্মানী পোশাক। এই বোরক খানকেই আমাদের পাদশাহ শেইখ আবদুল লতীফ ও দদশের হাতে কামান ও বন্দুক পাঠিয়েছিলেন। আমি যখন পেঁছিলাম তার আগেই সমরকন্দ অধিপতি আবদুল

লতীফ মারা গেছেন (মৃত্যুকাল হিজরী ৯৫৯ বা খ্রীষ্টাব্দ ১৫৫১)। এবং বোরক খান তার শূন্যস্থান পূরণ করেছেন। বালখে পীর মহম্মদ খান এবং বুখারায় বুরহান সঈদ খান স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে বসেছেন (শেষোক্তজন অল্পকাল রাজত্বের পর হিজরী ৯৬৪ বা ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান)। এই পরিস্থিতির মীমাংসাই হয়ে দাঁড়াল বোরক খানের প্রথম কাজ। প্রথমে সমরকন্দ অধিকার করলেন তিনি। তারপর এগোলেন শহর-ই-সবজ (কেশ)। বিরাট যুদ্ধ হল সেখানে। এ যুদ্ধে ওসমান (অটোমান) সেনাদের কেতখুদা (বা দলনায়ক) মারা গেলেন। বোরক খান সেখানকার দুর্গটি দখল করার পর করলেন বুখারা অভিযান। করলেন শহর অবরোধ। বুখারার শাসক, সঈদ বুরহান শান্তি চুক্তি করলেন বোরক খানের সাথে। তার হাতে বুখারা সমর্পণ ক'রে তিনি প্রস্থান করলেন তার ভাই পীর মহম্মদ খানের রাজ্য, করকুল-এ। পীর মহম্মদ সঈদ বুরহানকেই অর্পণ করলেন সে অঞ্চলটি।

"বোরক খান যখন সমরকন্দ দখল করেন তখন ওসমানদের আগা (আধুনিক অটোমান সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষের বিশেষণ) সামান্য কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তাশকন্দ ও তুর্কীস্তানের সড়ক ধরে তুর্কীর পথে সবে রওনা হয়ে গেছেন। আহমদ চৌশও বুখারা এবং খওয়রিজমের সড়ক ধরে তুর্কী ফেরার আয়োজন ক'রে চলেছেন। কেননা, বাহিনীর একাংশ তখন যোগ দিয়েছে সঈদ বুরহানের সেনাদলে, আরেক অংশ তার ছেলের সেনাদলে। অবশিষ্ট দেড়শোজনের মতো বোরক খানের অনুগত হয়ে তারই কাছে থেকে গেছে। এই ঘটনাবলীর কথা সবিস্তারে আমার কাছে বর্ণনা ক'রে তিনি (বোরক খান) আক্ষেপের সুরে বললেন 'তুর্কীর মহামান্য সুলতানের কাছে আমি এখন মিথ্যাবাদী সাজলাম। কিন্তু আমার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তবে, আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে এখনো হয়তো কিছু ক'রে ওঠা যেতে পারে।' তিনি আমাকে

একটি প্রদেশের শাসনকর্তার পদ দেয়ার প্রস্তাব করলেন। আমি উত্তর দিলাম : এরকম সামান্য সেনা নিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের পাদশাহের অনুমতি ছাড়া আমার পক্ষেও এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া অনুচিত। তখন তিনি তুরস্ক সরকারের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য এক দূত পাঠানোর প্রস্তাব তুললেন। আসলে, এ সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছেন তিনি। এ জন্য নির্বাচন করেছেন (তুর্কীস্তানের পীর) খাজা আহমদ যশভীর জনৈক বংশধর সদর আলমকে। পাদশাহের কাছে তার পত্র নিয়ে যাত্রা করলেন দূত। পাদশাহের প্রত্যেকটি ইচ্ছা ভবিষ্যতে পূরণ করার সদিচ্ছা ব্যক্ত করলেন তিনি সেই পত্রে। আমাকেও বিদায় অনুমতি দিলেন।

"সমরকন্দ থাকা কালে নবী দানিয়েলের সমাধিতে তীর্থ করার জন্য গেলাম খিদর। দর্শন করলাম তার আলখাল্লা, কাঠের পাদুকা এবং আলীর স্বহস্তে লিখিত কোরান খানি। এছাড়াও দর্শন করলাম আরো নানা সন্ত ও শেইখের সমাধি।

"বোরক খানের প্রসঙ্গেই ফিরে আসি আবার। একদিন আলাপ আলোচনা কালে আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন : এ পর্যন্ত যত শহর আপনি দেখেছেন তার মধ্যে কোনটি আপনার সব চেয়ে বেশি ভাল লেগেছে? উত্তরে এই চরণ দুটি আবৃত্তি করলাম আমি :

ঘর ছেড়ে দূরে, নয় তৃষ্ণাতুর কেউ স্বর্গও পেতে
সেরা তার কাছে আপন জনম ভুঁই এমন কি বাগদাদ হতে।

"চমৎকার উত্তর দিয়েছেন আপনি!" খান মন্তব্য করলেন।

নির্বাচিত দূত সদর আলম প্রথমে স্থির করেছিলেন তিনি তুর্কীস্তানের সড়ক ধরে কনস্তান্তিনোপল যাবেন। কিন্তু শুনতে পেলেন মনঘিত অঞ্চলের নোগাই উপজাতির লোকেরা যাত্রীদের মারধোর ও হত্যা ক'রে সর্বস্ব লুটপাট ক'রে নিচ্ছে। মুসলমানদেরও

রেহাই দিচ্ছে না। অতএব মতের পরিবর্তন ঘটালেন তিনি। শেষপর্যন্ত যাত্রা করলেন বুখারার পথ ধরে।

"দুর্ভাগ্য বশতঃ ঠিক এই সময়েই খবর এল সঈদ বুরহান আবার বোরক খানের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তার ছেলে খওয়রিজম শাহকে ইতিমধ্যেই আক্রমণ করা হয়েছে। বোরক খান তখন পরামর্শ দিলেন: যতদিন না দূত ফিরে আসে ঘিজ-দুওয়ান-এ গিয়ে অপেক্ষা করুন আপনি। যদি কোন যুদ্ধ না বাধে ওই পথ ধরেই ভ্রমণ করতে পারবেন। অন্যথায়, যতদিন পর্যন্ত না বুখারার পথ ধরে আপনাদের নিরাপদে এগিয়ে দিয়ে আসার মতো কাউকে সংগ্রহ করতে পারছি, ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।"

সম্মত হলেন সীদী আলী। রমজান মাসের পাঁচ তারিখ রওনা হলেন সেই উদ্দেশ্যে। কলা ও করমিনা হয়ে পেঁাছলেন সমরকন্দ নদীকূলে (জরাফশান বা কোহিক নদী)। দোয়াবের কাছে পার হলেন তাকে। উপস্থিত হলেন ঘিজদওয়ান। সেখানে পেঁাছে তীর্থ ক'রে নিলেন খাজা আবদুল খলীকের সমাধিতে।

মীর্জা তখন ঘিজদওয়ানে অনুপস্থিত। কোথায় গেছেন তারও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। চললাম তাই পুল রবাতের দিকে এগিয়ে। খওয়রিজম শাহের সেনারা তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি ক'রে চলেছে। একদিন তার শিক্ষক খান আলী বে আচমকা সীদী আলীকে প্রশ্ন ক'রে বসলেন: 'কোথায় চলেছেন আপনারা?' সীদী আলী উত্তর দিলেন: বুখারায়। তিনি বললেন 'বুখারার শাসক সঈদ বুরহান সুলতানজাদা খওয়রিজম শাহকে আক্রমণ করার হুমকি দিয়ে চলেছেন। আপনি অনুগ্রহ ক'রে এ সময়ে আমাদের সাহায্য করুন।' সীদী আলী উত্তরে বললেন: 'তা এখন কি ক'রে সম্ভব। আমরা কোন পক্ষকেই সাহায্য করছি না। বোরক খানও আমাদের কোনরকম অনুরোধ করেননি সেজন্য।

উলটে বরঞ্চ, খিজদওয়ান চলে যাবার জন্য বাধ্য করেছেন, শত্রু মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করতে বলেছেন।'

এগিয়ে চলতে থাকলেন সীদী আলী রঈস। মিনারের কাছাকাছি হতেই শখানেক কুর্তা পরা ফৌজ তাদের তেড়ে এল। চীৎকার ক'রে বলল: মীর্জার দোহাই। ফিরে যাও। সীদী আলীর একজন সঙ্গীর ওপর মারও বসাল তারা। সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন সীদী আলী।

যুদ্ধ প্রায় বাধে বাধে। এমন সময় ভিড় ঠেলে হঠাৎ একজন সঈদ এগিয়ে এলেন, উজবেগদের জলদ কণ্ঠে হুকুম দিলেন থেমে যাওয়ার জন্য। উভয় পক্ষই পিছু হটে গেল। সঈদ ঘোষণা করলেন: মীর্জা আপনাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে আপনারা আরো এগিয়ে আসেন এ তার ইচ্ছে নয়। বরং দূর থেকে সব দেখে চলুন।

অতএব সঙ্গীদের নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলেন সীদী আলী। দশজনের একটি দল নিয়ে তারপর দেখা করতে গেলেন মীর্জার সঙ্গে। মীর্জা খওয়রিজম শাহ-ও আবার অনুরোধ জানালেন সঈদ বুরহানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য। অস্বীকার করলেন সীদী আলী। তখন জোর ক'রে তাদের কাছ থেকে দশটি বন্দুক ছিনিয়ে নেয়া হল। নির্দেশ দেয়া হল চুপচাপ দর্শকরূপে সব কিছু দেখে চলার জন্য। "মীর্জার বিক্রম তখন রীতিমতো তুঙ্গে। এবং শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত তা সমানে প্রদর্শন ক'রে চললেন তিনি। প্রবাদ রয়েছে: 'কানে থাপ্পড় না পড়া পর্যন্ত সকলেই মনে করে তার কব্জী লোহা দিয়ে তৈরী'।"

বিপরীত দিক থেকে সঈদ বুরহানের সৈন্যদের আবির্ভাব ঘটা মাত্র কিন্তু মীর্জার সব লম্ফঝম্প থেমে গেল। তাড়াতাড়ি পিছু হটে সেতুর ওপারে রবাতে (করওয়ন সরাই) গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ছজন সঙ্গীকে নিয়ে সীদী আলীও গেলেন।

সঈদ বুরহান এক হাজারের মতো কিজিল-আইয়াক বা বুখারী যুবক ও চল্লিশ জন তুর্কী তীরন্দাজ নিয়ে এগিয়ে এলেন। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য বেশ ভালোভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন তিনি।

মীর্জাকে পরাজিত করতে তার মুহূর্তও লাগল না। গুলিবিদ্ধ হয়ে পতাকা, নকারা ও যুদ্ধের যা কিছু হাতিয়ার ও সাজসরঞ্জাম ফেলে পালিয়ে গেলেন তিনি। সীদী আলীর সঙ্গীদের মধ্যেও তিনজন মীর্জার পিছু পিছু পালালেন। কিন্তু পিছু ধাওয়া করা সেনাদের বর্শার আঘাতে একজন অল্পসময়ের মধ্যে প্রাণ হারালেন। অন্যরা উজবেগ সেনাদের সঙ্গে আশ্রয় নিলেন গিয়ে রবাতে। কিন্তু সঈদ বুরহান সেখানেও আবার তাদের আক্রমণ করল।

দুজন সঙ্গীর ওপর ঘোড়াটির ভার দিয়ে সীদী আলী সৈন্যদের কাছ থেকে মীর্জার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য এগিয়ে গেলেন। জানতে পেলেন রবাতের খুব কাছে ছাউনি ফেলেছেন তিনি। অনুরোধ জানালেন তার কাছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কয়েকজন সেনার রক্ষণাধীনে যখন তিনি সেতু পার হয়ে চলেছেন এমন সময় অন্য কতক সেনা তাকে তাক ক'রে তীর ছুঁড়ল। একটি তীর তার গায়েও বিঁধল এসে। তারপরেই তারা তরবারী নিয়ে চারদিক থেকে আক্রমণ করল তাকে।

প্রাণ খোয়াতে খোয়াতে অতি অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন সীদী আলী। খানের অধীনে কর্মরত জনাকয়েক ওসমান সেনা সীদী আলীকে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি এই দৃশ্য দেখে হাঁক তুলে ছুটে এল। "ইনি আমাদের সুলতানের অতিথি, একে কেন তোমরা এভাবে আক্রমণ করছ? এসবের মানে কি?" এ হাঁক শুনে আক্রমণকারী জওবেগী (১০ জন সেনার নায়ক) তাড়াতাড়ি তরবারী সরিয়ে নিল। খানের কাছে ঘটনার সংবাদ গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন তিনি। তেজোদ্দীপ্ত সুঠাম যুবক। এসেই সীদী আলীকে জড়িয়ে ধরে এই অঘটনের জন্য ক্ষমা চাইলেন।

জানালেন, যা ঘটে গেছে তা আদপেই ইচ্ছাকৃত নয়, সম্পূর্ণই আকস্মিক ঘটনা। আরো বললেন : আপনি এই যুদ্ধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার দরুন 'ভিজে ও শুকনো একসঙ্গে জ্বলে' এই আপ্তবাক্য অনুসরণ ক'রেই ওরা আপনাকে আক্রমণ ক'রে বসেছে। এরপর দলবল সহ সীদী আলী যাতে নিরাপদে সেতু পার হতে পারেন কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীর ওপর তার দায়িত্ব অর্পণ করলেন তিনি।

কিন্তু তবুও মালপত্র স্থানান্তরের বেলা কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটল। সীদী আলীর দুজন লোক আক্রান্ত হয়ে তরবারীর ঘায়ে জখম হল। একটি চমৎকার যাত্রী বহনকারী ঘোড়া, রান্নাবান্নার যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম, একটি অস্ত্রবাহী এবং আরো দশটি যাত্রীবাহী ঘোড়া সেনারা চুরি ক'রে নিল। অনেক ঝঞ্ঝাট সয়ে বেশ অসুবিধার মধ্যেই সেতু পার হলেন। তারপর সামান্য কিছুদূর এগিয়ে সদলবলে যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন খান তাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে রবাতে ঘাঁটী ক'রে থাকা তুর্কী সেনাদের হুকুম দিলেন সে এলাকাটির ভার পুরোপুরি তার হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য। তারা যে শত্রুপক্ষ ভুক্ত নন কিংবা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণও নন তা উপলব্ধি করতে পরেই এ পদক্ষেপ নিলেন তিনি। রবাতের কর্তৃত্ব তার ওপরে বর্তানোর ফলে চুরি যাওয়া মালপত্র কিছু কিছু পুনরুদ্ধারে সমর্থ হলেও কতক ঘোড়া এবং বন্দুকগুলির অধিকাংশই আর ফিরে পাওয়া গেল না।

সীদী আলীর যে তিনজন সঙ্গী মীর্জা খওয়রিজমের পিছু পিছু পালিয়েছিলেন তাদের একজন প্রাণ খোয়ালেও অন্য দুজন খানের সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তারা অনেক কষ্টে পালিয়ে শেষ অবধি সীদী আলীর কাছে ফিরে এলেন। সবাইকে নিয়ে শহর রবাতের দিকে এগিয়ে চলে রাত নাগাদ সেখানে পৌঁছলেন সীদী আলী। সঈদ বুরহান বেশ খাতির যত্ন ক'রে চললেন তাকে। একসময়ে বললেন : আপনি আমার জীবন-দিশারী হওয়ার

দায়িত্ব নিন। তাহলে অনায়াসে এ অঞ্চলে একদিন আপনার পাদশাহের আধিপত্য বিস্তৃত হতে পারবে। আপনি বুখারা শাসন করবেন, আমি ফিরে যাব করকুল। 'উঁহু' উত্তর দিলেন সীদী আলী 'সারা তূরান অঞ্চলও যদি দেন তাহলেও এখানে থাকার কোন ইচ্ছা আমার নেই। তবে হ্যাঁ! আমি আমার সরকারকে জানাব যে আপনার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। সুমহান পাদশাহ সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। এই প্রদেশগুলির সরকারী কর্তৃত্ব হয়ত তখন তিনি আপনার ওপরেই ছেড়ে দিতে পারেন।' একথা শুনে খান খুশী হলেন। সীদী আলী রঈসের সম্মানে এক ভূরিভোজের আয়োজন করলেন। বেশ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ক'রে চললেন তার সঙ্গে। যে এক পক্ষ কাল সীদী আলী বুখারায় কাটালেন তার প্রত্যেক দিনই যে সুন্দর বাগিচাটিতে তার বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাত ও গল্প-গুজব করলেন। সীদী আলীও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি গজল রচনা ক'রে উপহার দিলেন তাকে। সেটি পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন সঈদ বুরহান। কাব্য প্রসঙ্গ নিয়েও এর ফলে বহু আলোচনা হল দুজনের মধ্যে। সুযোগ বুঝে একদিন যাবার অনুমতি চাইলেন সীদী আলী। অনুমতি দিতে কার্পণ্য না করলেও সঈদ বুরহান চাপ দিয়ে বসলেন যে তার কাছে থাকা লোহার তুর্কী বন্দুকগুলি দিয়ে যেতে হবে তাকে। তবে একবারে শুধু হাতে নয়। তার বদলে তিনি নিজেদের তৈরি পিতলের বন্দুক দেবেন সীদী আলীকে। এজন্য তিনি এত পীড়াপীড়ি শুরু করলেন যে একরকম বাধ্য হয়েই ৪০টি পিতলের বন্দুকের বদলে সঙ্গে থাকা সব কটি লোহার বন্দুক দিয়ে দিলেন। এমনকি, একটি খোজা ঘোড়ার বদলে নিজের চমৎকার বাড়তি ঘোড়াটিও দিয়ে দিতে হল তাকে। দিতে হল দুখানি মূল্যবান পুঁথিও।

বোরক খান প্রেরিত দূত ইতিমধ্যে তুরস্ক থেকে ফিরে এলেন। সীদী আলীর প্রতি পুত্র খওয়রিজম শাহ যে দুর্ব্যবহার করেছেন সেজন্য তার কাছে ক্ষমা চাইলেন বোরক খান। অন্যদিকে খিজদওয়ান-বাসী আবছুল সুলতানের মধ্যস্থতায় সঈদ বুরহানের সঙ্গেও মৈত্রী চুক্তি করলেন। পুরো এলাকা জুড়ে আবার শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ ফিরে এল।

বুখারার বিভিন্ন শেইখ ও সন্তদের সমাধিতে তীর্থ ক'রে সীদী আলীও সদলবলে রওনা হলেন খওয়রিজম।

প্রথমে গেলেন তারা করকুল। তারপর ফরব। জাহাজে চেপে ইক্ষু বা অক্সাস নদী পার হলেন। পৌঁছলেন খওয়রিজম অর্থাৎ ইরানের বুকে। শওয়াল মাসের শুরু হয়েছে তখন সবে। প্রথম যে শহরটিতে তারা বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামলেন সেটির নাম চরজূই। সঠিকভাবে চিহরজূই বা চার নদীর শহর। ইক্ষুর চার শাখা নদী এরা। সেখানে প্রথমেই তীর্থ করতে গেলেন সীদী আলী ইমাম আলী মুসার খোজা মেসহেদ-এর সমাধিতে। তারপর হরিৎ বনরাজি এলাকার মধ্য দিয়ে নদীর বাম উপকূল বরাবর এগিয়ে চললেন খওয়রিজম শহরের দিকে। কি দিন কি রাত প্রতিটি মুহূর্ত সজাগ থেকে সিংহের সঙ্গে লড়াই ক'রে ক'রে এগিয়ে চলতে হল তাদের। (বর্তমানে কিন্তু এ অঞ্চল থেকে সিংহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত)। একা একা জল আনতে যাওয়া পর্যন্ত নিরাপদ নয়। এভাবে দশদিন অবর্ণনীয় আতঙ্কের মধ্যে সর্বক্ষণ প্রাণ হাতে নিয়ে পথ চলার পর হজরেস্পে পৌঁছলেন। আরো পাঁচদিন পর খিবায়।

॥ বারো ॥

পহলওয়ান মাহমুদ পীরের সমাধি দর্শনের পর শওয়াল মাসের শেষ নাগাদ আবার যাত্রা শুরু হল। খিবা থেকে পুরো পাঁচ দিন পথ চলার পর এলেন খওয়ারিজম। গেলেন (বুজুগ খানের ছেলে) দোস্ত মহম্মদ খান ও তার ভাই অশ সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ক'রে নিলেন পীরদের সমাধি দর্শন ক'রে পুণ্য সঞ্চয়ও।

এখানে থাকাকালে সীদী আলী জানতে পেলেন, সুফী দর্শনের ক্ষেত্রে তার তাত্ত্বিক গুরু পরম শ্রদ্ধেয় শেইখ আবদুল লতীফ এখানকার ওয়জীর শহরে মারা গেছেন। আর স্থির থাকতে পারলেন না তিনি। তার সমাধিতে তীর্থ ক'রে আসার জন্য জনাকয়েক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলেন সেখানে। সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছে তার স্বর্গত আত্মার চিরশান্তি ও কল্যাণ কামনা ক'রে সমগ্র কোরান পাঠ করলেন। পোলাও রান্না ক'রে ছোটখাট একটি ভোজও দিলেন। রচনা করলেন অক্ষরভিত্তিক কালপঞ্জীসূচক একটি অর্ঘ-কবিতাও।

অগতাই খানের তিন পুত্র হাজী মহম্মদ সুলতান, তৈমূর সুলতান ও মাহমুদ সুলতান মনঘিত সর্দারদের কাছে সুপারিশপত্র লিখে দিলেন। তাই নিয়ে খওয়ারিজম ফিরে এলেন সীদী আলী। ইতিমধ্যে বোরক খানের দূত শেইখ সদর আলমও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। যাত্রা শুরু হল। অনুচরবর্গসহ সীদী আলী ছাড়াও যাত্রীদলে রয়েছেন খওয়ারিজমের শেইখ হুসেনের পত্নী (মখদুম আজমের কন্যা) ও ছেলে এবং আরো কয়েকজন মুসলমান। গাড়িতে চেপে এগিয়ে চললেন সকলে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই পরনে ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক। সীদী আলী এবং তার দলবলকেও তারা ঐরূপ পোশাক পরার জন্য পরামর্শ দিতে থাকলেন।

বললেন ঃ মনঘিতরা উজবেগদের চেয়েও বর্বর। কোন বিদেশী দেখলেই তারা ধরে নেয় সে রুশী। আর এরকম ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ দেয়া মানেই তাদের আক্রমণের শিকার হওয়া।

রাশিয়ার সম্রাট বা জার আইভ্যান ওয়াসিলাইভিচ অস্ত্রখান অধিকার ক'রে নেয়ার দরুন ১৫৫৪ থেকে মধ্য-এশিয়ার যাযাবরদের মধ্যে রুশী আতঙ্ক ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছিল।

সকলের চাপে পড়ে সীদী আলী এবং তার অনুচরবর্গও অগত্যা সেই বিজাতীয় বা মনঘিতদের পোশাক সংগ্রহ ক'রে তা পরে নিলেন। সীদী আলী তার অনুচরদের বোঝালেন ঃ

> দুনিয়া জোড়া সবাই মিলে যে পথ ধরে চলে।
> বিজ্ঞ সদা সেপথ ধরে তর্ক নাহি তুলে॥

শুধু পথ চলা আর পথ চলা। সে যেন আর শেষ হতে চায় না। যাত্রা যখন শুরু করেছিলেন তখন জিলকাদ মাসের প্রথম সপ্তাহ। এক মাসেরও বেশি পার হয়ে গেল দেশ-তি কিপচাক বা কিরঘিজ তৃণাঞ্চলের বুকের ওপর দিয়ে চলেছেন তারা। শরতের শেষ লগ্ন। কোথাও একটি পাখি চোখে পড়ে না। কি আকাশ, কি বালুভরা মাটির বুক—কোথাও না। না একটা ওনগর বা বুনো গাধার চেহারাও। স্নিগ্ধ সবুজেরও চিহ্নবর্ণ নেই কোথাও। নেই এক ফোঁটা জলেরও দেখা।

তবু একসময়ে সে সীমাহীন মরুপ্রান্তর শেষ হল। পৌঁছলেন যাত্রীদল শাম-এ। তারপর অল্পকালের মধ্যে (উরাল নদীকূলের একটি ছোট্ট শহর) সরাইজিক-এ। (এখান থেকে কাস্পিয়ান সাগর কূল মাত্র ঘণ্টাখানেকের পথ)। সমরকন্দ থেকে তুরস্ক যাবার জন্য বিদায় নেয়া তিনজন মুসলমান ও জনাকয়েক হাজীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেখানে। প্রথম তিনজনের অবস্থা বেশ করুণ। পুরোপুরি উলঙ্গ। সীদী আলী ও তার সঙ্গের যাত্রীদের দেখে তারা চীৎকার তুললঃ কোথায় চলেছেন আপনারা? রুশীরা

অস্ত্রখান দখল ক'রে নিয়েছে। আহমদ চৌশ-এর সঙ্গে তাদের জোর লড়াই হয়ে গেছে। এদিকে অব্‌সলন মীর্জার লোকেরা আমাদের আগাকে (বাহিনীর অধ্যক্ষকে) আক্রমণ ক'রে সবকিছু লুটপাট ক'রে নিয়েছে। সড়ক বন্ধ। সময় থাকতে সাবধান হোন। ফিরে যান।

শুনে সীদী আলী এই চরণ দুটি আওড়ালেন ঃ

আমরা নিঃস্বের দল কি ক্ষতি করবে আর কেউ আমাদের
হাজার উদ্যত অস্ত্র সাধ্য কি লুটবে কিছু নেইকো যাদের।

কিন্তু তা মোটেই অনুপ্রাণিত করল না অন্যদের। বিশেষ ক'রে সঙ্গের বণিকরা তো একেবারেই একমত হলেন না তার সাথে। তারা প্রস্তাব তুললেন ঃ কিছুদিন না হয় খওয়রিজমে অপেক্ষা ক'রে ঘটনার গতি লক্ষ্য করা যাক।

রাজদূত এবং অন্যান্য মুসলমানেরাও সেই মতের অনুবর্তী হলেন। অতএব সীদী আলী-কেও অনিচ্ছাসত্বে তাদের পিছু পিছু আবার সেই সুদীর্ঘ মরুপ্রান্তর পার হয়ে খওয়রিজম ফিরে আসতে হল।

রাজদূত সোজা সমরকন্দ ফিরে গেলেন। অন্যরা অপেক্ষা ক'রে চললেন খওয়রিজমে। খিবার সুলতান দোস্ত মহম্মদ খান সীদী আলীকে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি এখন কোন পথ দিয়ে যাবার কথা ভাবছেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ খুরাসানের মেসহদ থেকে ইরাক অজমী ও তারপর সেখান থেকে বাগদাদ হয়ে। খান তা শুনে বললেন ঃ তার চেয়ে এখানেই কিছুদিন থেকে যান। বসন্ত কাল এলেই মনঘিতরা চারণভূমির খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। রুশীরাও ততদিনে হয়ত ও-দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তাছাড়া মনে রাখবেন বাগদাদের পথটি বেশ ঘোরালো ও দীর্ঘ।

সীদী আলী রাজী হলেন না তার প্রস্তাবে। আপন সিদ্ধান্তে অটল থেকে তারই সমর্থনে কাব্যিক সুরে মন্তব্য করলেন 'প্রেমিকের

কাছে বাগদাদ আদপেই দূর নয়।' অতএব খানকে হার মানতে হল। যাবার অনুমতি দিলেন তিনি। ভ্রমণের জন্য সীদী আলীকে দিলেন একটি তেজী ও সুঠাম ঘোড়া উপহার। আর সঙ্গীদের জন্য দিলেন গাড়ি। যে গাড়িগুলিতে চড়ে তারা এখানে ফিরে এসেছেন সেই গাড়িগুলিই।

ঠিক কোন সড়ক পথ ধরে যাওয়া হবে তা ঠিক করতে গিয়ে প্রথমে সীদী আলী পরিকল্পনা করলেন কাস্পিয়ান সাগর ও শির-ভানের পথ ধরে যাবেন। কিন্তু সঙ্গীদের তা পছন্দ হল না। তারা দর্শালেন, যে মুসলমান সেনাবাহিনী কফা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তারা বর্তমানে আবদুল্লা খানের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ক'রে চলেছে। সুতরাং তিনি কোন তুর্কীকেই সে পথ ধরে যাবার অনুমতি দেবেন না। তখন দমির কপু হয়ে সারকাসিয়ার পথ ধরে যাওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে থাকলেন। কিন্তু শুনতে পেলেন যে সারকাসিয়ানরা বিদ্রোহ শুরু করেছে। অতএব একমাত্র সেই যা খুরাসান ও ইরাকের পথটিই খোলা তাদের সামনে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পেলেন যে তুর্কীর পাদশাহের সঙ্গে খুরাসান ও ইরাক বা পারস্যের শাহের বর্তমানে বেশ সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে কিজিলবাসের বে (শীয়া রাজকর্মচারী) সম্ভবতঃ শাহের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি সংগ্রহে অন্তরায় হয়ে দেখা দেবেন। সীদী আলী মনে মনে ভাবলেন—ভগবান যদি ক্ষতি করতে না চান তবে কারো সাধ্য নেই কোন ক্ষতি করে। তাছাড়া মরণ কিংবা বিপদকে যারা ভয় করে তাদের তো ভ্রমণে বার হওয়াই উচিত নয়। কোরান খুলে ভাগ্য পরীক্ষাও ক'রে নিলেন তিনি। সেখানেও শুভ সংকেত পাওয়া গেল। অতএব পারস্যের পথ ধরেই যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। উট ভাড়া ক'রে ও অন্যান্য সব প্রস্তুতি শেষ ক'রে তিনি খিবার সুলতান দোস্ত মহম্মদ খানের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন। কথায় কথায়

তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন : শত্রু এলাকার মধ্য দিয়ে আপনাদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভ্রমণ করা সম্ভব নয়। সীদী আলী তখন বন্দুক-গুলিকে দুভাগ ক'রে এক অংশ দিলেন দোস্ত মহম্মদ খানকে, অন্য অংশ দিলেন তার ভাই অশ সুলতানকে। টিন সুলতানের এক ভাই আলী সুলতানের কাছে লেখা একটি সুপারিশ-পত্রও দেয়া হল সীদী আলীকে। সেটি নিয়ে, প্রয়োজনীয় সবরকম উপকরণে সুসজ্জিত হয়ে এবং বিশেষ ক'রে জল বয়ে নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিস্তি বা চামড়ার বড় বড় থলি সঙ্গে নিয়ে ভগবান ভরসা ক'রে শেষ পর্যন্ত খওয়রিজম থেকে পারস্য অভিমুখে যাত্রা করলেন তারা। জিলহিজ্জ মাসের গোড়ার কথা এ।

॥ তেরো ॥

নিরাপদে ইক্ষুনদী পার হয়ে তার অপর কূলে ছাউনি ফেললেন সীদী আলী ও তার অনুচরেরা। অপেক্ষা ক'রে চললেন দলের অন্যান্য সহযাত্রীরাও। শেইখ হুসেনের স্ত্রী সেখানে সীদী আলীকে খবর পাঠালেন ঃ রাতে তিনি তার পিতা পূজনীয় মখদুম আজমকে স্বপ্নে দেখেছেন। তিনি যেন অপর এক পূজনীয় সন্তের সঙ্গে ওয়জীর থেকে খওয়রিজম এসেছেন। শহরে ঢুকতে স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে সহর্ষ সংবর্ধনা জানাল। তিনি তখন তাদের লক্ষ্য ক'রে বললেন 'মীর সীদী আলী ওয়জীরে আমার সমাধিতে গিয়ে কোরান পাঠ করেছে। আমার আনুকূল্য লাভের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছে। তাই তাকে সাহায্য করার জন্য, তাকে খুরাসানের মধ্য দিয়ে নিরাপদে এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য আমি এসেছি।' এই বার্তা পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হ'ল সীদী আলীর মন। পরের দিন ছাউনি গুটিয়ে যাত্রারম্ভ করলেন। পৌঁছে গেলেন পর দিন সকালেই দরুম। এরপর নির্বিঘ্নে অতিক্রম করলেন মাহমুদ সুলতান। এগিয়ে চললেন বগওয়াই। সর্বক্ষণ তারা বাধা লাভের আশঙ্কা ক'রে চললেও সে স্থানটিও নির্ঝঞ্ঝাটে পার হলেন যাত্রীরা। পুলদ খান কোনরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল না। পৌঁছলেন সকলে এসে নিস। এখানে টিন সুলতানের ভাই, মার্ভের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা আলী সুলতানের সঙ্গে দেখা করলেন সীদী আলী রঈস। অশ সুলতানের সুপারিশ পত্রটি পেশ করলেন। মিলে গেল অবাধ ছাড়পত্র। 'কেননা, এ অঞ্চলের সকলেই তুর্কীর পাদশাহের প্রতি অনুরক্ত।' এগিয়ে চলে এরপর এসে গেলেন তারা বওয়র্দ (অবিওয়র্দ=আধুনিক কহক) এবং তারপর তুস। সেখানে পৌঁছে ইমাম মহম্মদ হানিফ ও কবি ফির্দৌসীর সমাধি

দর্শন করলেন। ৯৬৪ হিজরীর মহরম মাসের পয়লা তারিখে এলেন তারা মেসহদ-ই খুরাসান। তীর্থ করতে গেলেন খুরাসানের সুলতান ইমাম আলী মুসা রিজার সমাধিতে।

সাগর পরিক্রমা কালে যে সময় ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন তখন ইমামের দরগায় এক তুমান (স্বর্ণমুদ্রা) দানের মানসিক করেন সীদী আলী। এবার তা পূরণ করলেন। এই সঙ্গে মুতাওয়ল্লী বা মসজিদ ও সমাধি স্মারকের তত্ত্বাবধায়ককেও এক তুমান উপহার দিলেন তিনি। দেয়া হল এক তুমান সঈদকেও।

মেসহদে থাকাকালে দেখা করলেন তিনি স্থানীয় সুলতান ইব্রাহীম মীর্জার সঙ্গে। ইনি বহরম মীর্জার পুত্র। শাহর পুত্র সুলেইমান মীর্জা ও তার ওয়কীল ককচী খলীফার সঙ্গেও দেখা হল। তারা তাকে এক ভোজ দিয়ে আপ্যায়িত করলেন।

আলাপ-আলোচনা কালে তারা স্বভাবতই (ধর্মীয়) উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ এবং খলীফা আলী, আবু বকর, ওমর ও ওসমানের পবিত্রতাকে কেন্দ্র ক'রে তর্ক তুলে তার মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে চাইলেন সীদী আলী রঈসকে। কিন্তু 'মৌনতাই মূর্খের প্রতি শ্রেষ্ঠ উত্তর' এই আপ্তবাক্য অনুসরণ ক'রে চুপ থেকে সে-আলোচনা পাশ কাটিয়ে চললেন তিনি। কিন্তু তারাও তা হতে দেবে না। নানা কায়দায় তার ওপর চাপ সৃষ্টি ক'রে চলল। তখন তাদের খাজা নসর-উদ্দীনের কাহিনীটি শোনালেন তিনি। এক মসজিদে নসরউদ্দীনকে কোরান পাঠের জন্য পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি উত্তর দেন 'এ তার উপযুক্ত স্থান নয়'। কাহিনীটি শুনিয়ে সীদী আলী বললেন: 'আমি আপনাদের সঙ্গে তর্ক করার জন্য এখানে আসিনি। অতএব এ জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপনে আমার আপত্তি আছে।'

ভোজ সভায় উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে একজন ছিলেন রীতিমতো 'শয়তান চরিত্রের। নাম তার ঘাজী বে।' তিনি বিষ ঢালতে সুরু ক'রে দিলেন। 'এ ধরনের লোকদের শাহের কাছে

পাঠান একেবারেই উচিত নয়। রক্ষী হিসাবে যাদের সঙ্গে দিয়ে এদের পাঠান হবে তাদেরই যে এরা হত্যা ক'রে পালিয়ে যাবে না তার কি কিছু ঠিকঠিকানা আছে? বোরক খানের কাছে যে-সব ওসমানদের পাঠান হয়েছিল এরা খুব সম্ভব সেই দলেরই লোক। নয়তো কোন গুপ্ত সংবাদ টংবাদ বয়ে নিয়ে চলেছে। ওদের সঙ্গে কি আছে না আছে আমাদের তা ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত। মীর্জা ইব্রাহীমও এতে সায় দিলেন।

পরদিন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বর্ম-শিরস্ত্রাণ-আঁটা দুশো জনের মতো সৈন্য যাত্রীনিবাসটিকে ঘিরে ফেলল। করা হল সীদী আলীকে সদলবলে বন্দী। জন পিছু এক একজন রক্ষীর প্রহরাধীনে নিয়ে যাওয়া হল তাদের ককচী খলীফার আবাসে। সীদী আলীর ওপর নজর রেখে চলল দুজন সেনা। এ ছাড়া একজনের ওপর দায়িত্ব দেয়া হল তার ঘোড়ার। অন্যান্য সব সামগ্রী নিয়ে জমা করা হল মূতাওয়লীর কাছে। এমন কি পোশাক-আশাক পর্যন্ত গা থেকে খুলে নিয়ে যাওয়া হল। শীতকাল তখন। সুতরাং ঠাণ্ডায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে চলল সকলে।

পরের দিন সীদী আলীর কাছ থেকে তার দপ্তর সংক্রান্ত সব কাগজপত্র, অন্যান্য যা কিছু লেখা কাগজ এবং বিভিন্ন পাদশাহ ও সুলতানদের দেয়া যাবতীয় চিঠিপত্র নিয়ে সেগুলিকে পরখ ক'রে তারপর একটি থলিতে ভরে সীলমোহর এঁটে দিলেন।

সীদী আলীর সঙ্গীসাথীদের মনে তো তা দেখে আতঙ্ক দেখা দিল। প্রাণভয়ে রীতিমতো কাঁপতে সুরু ক'রে দিলেন তারা। সীদী আলী তা দেখে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে চললেন। বললেন: যখন কোন অপরাধ করিনি আমরা তখন ভয় পাবারও কিছু নেই। আর, জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু তো একদিন আসবেই। 'ভাগ্য যখন তোমাকে এই মর্ত্যলোকে নিয়ে আসার কথা ভোলেনি, তখন নিয়ে যাবার কথাটিও ভুলবে না।' তাছাড়া 'ধৈর্য-ই হচ্ছে সাফল্যের

প্রধান ভিত্তি'—সুতরাং যে পরিস্থিতিই সামনে আসুক না কেন ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করাই সঙ্গত।

অতএব ভাগ্যের হাতে সব কিছু সমর্পণ ক'রে শান্ত চিত্তে তারই জন্য অপেক্ষা ক'রে চললেন সকলে।

অল্পক্ষণ পরেই হাতে পায়ে শিকল এঁটে দেয়া হল প্রত্যেকের। ব্যতিক্রম ঘটল শুধু সীদী আলীর বেলা। তাকে রাখা হল পাঁচ জন প্রহরীর সতর্ক প্রহরায়।

মীর্জার এ জাতীয় পদক্ষেপে সীদী আলী অবশ্য বিচলিত হলেন না। তবু বিষয়টিকে হালকা ভাবে নেয়ার চেষ্টা করেও তা পারলেন না। মনটা বেশ ভারি হয়ে উঠল। সব কিছু ভুলে থাকার জন্য শেষে কবিতার মধ্যে ডুব দিলেন। বসলেন গজল রচনা করতে। কাব্য প্রেরণায় কিছুক্ষণ পরে তার মন বেশ তাজা হয়ে উঠল। কবিতার চরণ চিন্তা করতে করতে একসময় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেই তার মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটি অপূর্ব চতুর্পদী কবিতা। জেগে উঠে সেটি লিখে ফেললেন তখুনি। ভেট স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন মূতাওয়লীর কাছে।

কবিতাটি স্থানীয় অভিজাতদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করল। ঠিক এরূপ সময়ে ইমামের সমাধি-স্মারকের এক কর্মচারী প্রকাশ করলেন যে খলীফা আলী স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে মীর সীদী আলীকে মুক্তি দেয়ার আদেশ করেছেন। এ স্বপ্ন কাহিনী সত্যি কি বানানো তা অবশ্য সীদী আলী জানেন না। বেশ দ্রুতগতিতে এটি শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং জনসাধারণের মনে আলোড়নের সৃষ্টি করল। স্বভাবতই তাদের সব সহানুভূতি বাঁক নিল এবার সীদী আলীর দিকে।

মূতাওয়লী ও সঈদ দুজনেই এবার মীর্জার সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন: এ লোকটি ইমামের দরগায় তীর্থ করতে এসেছেন। মানত রক্ষা ও শাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ এই দুটি আকাঙ্খাই এখানে

তাকে টেনে এনেছে। তুর্কীর পাদশাহের সঙ্গে আমাদের শাহর বর্তমানে যখন বন্ধুত্বের সম্পর্ক তখন একজন (তুর্কী) তীর্থযাত্রীকে হয়রান করা উচিত হবে না। বিশেষ ক'রে এই পবিত্র অশুর পর্বকালে (মহরম মাসের প্রথম দশদিন। পারস্যের শীয়াপন্থী মুসলিমদের কাছে এ সময় বিশেষ উৎসবের কাল)। লোকটি যদি বিশ্বাসঘাতক চরিত্রের হত তাহলে নিশ্চয়ই তা জানা পড়ে যেত এতক্ষণে। কেননা, কোরানেই রয়েছে 'বিশ্বাস ঘাতককে তার চেহারা থেকেই জানা যায়। এরপর আর তাকে কোনরকম সন্দেহ করা সাজে না।'

মীর্জা তাদের কথায় কিছুটা নরম হলেন। সীদী আলীও দর্শালেন যে কতক দায়িত্ব জ্ঞানহীন লোকের কথার ওপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে তার প্রতি এরূপ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। মীর্জার সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য তিনি তাকে তিনটি কবিতাও ভেট দিলেন।

এসবের পর 'আংশিক, পাছে শাহ বিরূপ হন এই ভয়ে এবং আংশিক, আপন হঠকারী পদক্ষেপে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে' অশুর বা মহরম মাসের দশ তারিখে মীর্জা তাদের মুক্ত ক'রে দিলেন। করলেন সীদী আলীর সম্মানে ভূরি ভোজনের আয়োজন। দেয়া হল তার পক্ষ থেকে তাকে নানা রকম উপহারও। আটক করা ঘোড়া, পোশাকপত্র ফেরৎ দেয়া হল। এ সত্ত্বেও দেখা গেল, সীদী আলীর নিজস্ব জিনিষপত্র মধ্যে বহু কিছু অদৃশ্য। পরবর্তী কালেও তা আর ফেরৎ পাননি তিনি। চারখানি মূল্যবান বই নিয়ে নেয়া হল। থলিতে সীল মোহর ক'রে রাখা যাবতীয় দলিল ও চিঠি পত্রাদি কপচাজী-বাশী বা থলি-রক্ষক আলী বে ও এক যশোলকে দিয়ে পাঠান হল শাহের কাছে। একটি টানা-গাড়িতে সেগুলি চাপিয়ে মহরম মাসের মাঝামাঝি যাত্রা করলেন তারা। চললেন সদলবলে সীদী আলীও।

শাহর এক পত্নী এবং বহরম মীর্জার এক পত্নীও চলেছেন এই যাত্রীদলের সঙ্গে। তারাও রাজধানী থেকে তীর্থ করতে এসেছিলেন ইমামের দরগায়। তীর্থ শেষে ফিরে চলেছেন এবার। সীদী আলী আলাপ জমালেন তাদের সাথে। তার সঙ্গে বেশ সদয় ব্যবহারই করলেন তারা। সীদী আলীর উপদেশে তার সঙ্গীরাও এই দুই বিশিষ্ট মহিলার রক্ষী ও পরিচর্যাকারীদের সঙ্গে শোভন ও বিনম্র ব্যবহার ক'রে চলল।

নিশাবুর পৌঁছে ইমামজাদা মহম্মদ মহরুক ও শেইখ অত্তর (ফরিদউদ্দীন)-এর সমাধি দর্শন করলেন সীদী আলী। দেখা হল এখানে খুরাসানের ওয়কীল আগা কামালের সাথে। তবে, তিনি তাদের ব্যাপারে নিজেকে কোনরকম জড়ালেন না।

সবজীওয়রে পৌঁছে কিছুটা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হলেন সীদী আলী। তবে 'যে কুকুর বেশি ঘেউ ঘেউ করে সে কখনো কামড়ায় না' এই আপ্তবাক্য স্মরণ ক'রে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে চললেন তারা। এই উগ্রপন্থীরা অবশ্য তাদের বেশিক্ষণ জ্বালাতন করার সুযোগ পেল না। তাদের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে আবার গন্তব্য স্থলের দিকে এগিয়ে চললেন তারা।

॥ চৌদ্দ ॥

চলতে চলতে এক সময়ে পা রাখলেন যাত্রীরা ইরাক প্রদেশের মাটিতে। দমওয়ন্দ পাহাড় মালার প্রান্ত ছুঁয়ে এগিয়ে চললেন। প্রথমে মজিনদ্রান। সেখান থেকে তারপর বস্তান। পৌঁছে দর্শন করতে গেলেন পুণ্যশ্লোক শেইখ ও সন্তদেও সমাধি। তারপর আবার যাত্রা শুরু ক'রে পরদিন এলেন দমগান।

সীদী আলীর অনুচরদের মধ্যে বোলুক-বাশী বা খণ্ড-বাহিনীর নায়ক রমজান তার ধর্মাসক্তির জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত। সবাই তাকে ধর্মপ্রাণ রমজান বলে ডাকতেন। তিনি সেদিন রাতে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন। শেইখ বায়জীদ জনা চল্লিশ দরবেশের সাথে সমবেত হয়ে বলছেন ঃ এস, মীর সীদী আলী যাতে নিরাপদে দেশে পৌঁছতে পারে সেজন্য আমরা প্রার্থনা জানাই। এরপর শেইখ একটি ছাড়পত্র লিখে তার ওপর সীলমোহরের ছাপ দিলেন। তাতে লেখা আছে 'যাত্রাপথে এদের প্রতি যেন কোন রকম পীড়ন বা দুর্ব্যবহার করা না হয়।'

এ স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে সীদী আলীর মন আনন্দে উছল হয়ে উঠল, এরূপ করুণাধারা বর্ষণের জন্য ঈশ্বরকে তিনি বার বার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে চললেন। সীদী আলীর বিশ্বাস প্রয়াত সন্তদের এই শুভেচ্ছাই প্রকৃতপক্ষে তার জীবন বাঁচিয়েছিল সে যাত্রা।

দমগানে পৌঁছে ইমাম জাফরের সমাধিসৌধ দর্শন ক'রে তারা সমনান যাত্রা করলেন। পৌঁছে যথারীতি সন্তদের সমাধি দর্শন ক'রে নিলেন। কিছু ব্যক্তি এখানে তাদের সাম্প্রদায়িক বিতর্ক মধ্যে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করল। সীদী আলী তার সঙ্গীদের সংযত ক'রে রাখলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন তাদের হাদীসের

বাণী 'আপন রত্ন—তোমার মতাদর্শ, তোমার ধর্মবিশ্বাস সযত্নে 'গোপন রাখ'। আরো বললেন : আমি যত ব্যাপক দেশভ্রমণ করেছি তোমরা তা করনি। সেই অভিজ্ঞতা আমায় যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কখনো বর্বর কি মূর্খের কথায় কিছু মনে করতে নেই।

তার কথার মর্ম উপলব্ধি ক'রে তারই পরামর্শ অনুযায়ী চলল তারা।

কিছুদিনের মধ্যেই (তেহরানের কাছে) রাই-এ এসে গেলেন যাত্রীরা। করলেন ইমাম আবদুল আজিম এবং ইমাম হুসেনের পত্নী বিবি শহরবানুর সমাধি দর্শন।

এই রাই-তেই শাহর এক ছেলে মহম্মদ খোদাবন্দ এবং কুরজী-বাশী বা প্রধান বর্মবাহক সবিনদূক আগার সঙ্গে পরিচয় হল সীদী আলীর।

কিছুকাল আগে শাহ ইসমাইল মীর্জাকে কজভিন থেকে হীরাটে স্থানান্তর করেন। তিনি চলে যাবাব পর কজভিনে তার শাসনকালের কতক কীর্তিকলাপ ফাঁস হয়ে যায়। তাই, আবার তাকে কজভিনে নিয়ে এলেন তিনি। ঘটনাবলীর তদন্তের পর স্থানীয় একজন অভিজাতকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। একই পরিণতি ঘটেছে ইসমাইলের জনাকয়েক অনুগামীর ভাগ্যেও। এরপর শাহজাদা মহম্মদ খুদাবন্দকে ডেকে পাঠিয়েছেন শাহ, তাকে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছেন কুরজী-বাশী সবিনদূক আগাকে। শাহর সেই ডাক পেয়েই বর্তমানে চলেছেন শাহজাদা।

সীদী আলী খুব খুশী হলেন শাহজাদার সঙ্গে পরিচয় করার সুযোগ পেয়ে। অন্যদিকে মহম্মদ খোদাবন্দও তাকে আশ্বস্ত করলেন তুর্কীর পাদশাহের প্রতি শাহের অটুট বন্ধু মনোভাবের কথা জানিয়ে।

রাই থেকে যাত্রা করা হল এবার কজভিনের উদ্দেশ্যে।

(পারস্যের মাটি স্পর্শ করার পর) পুরো দেড়টি মাস পথ চলে শেষ পর্যন্ত এলেন তারা ইরাকের রাজধানী কজভিনে।

কিন্তু নগরে প্রবেশের অনুমতি পেলেন না সীদী আলী। কাছের একটি গ্রাম সবজীঘের-এ আশ্রয় নিতে হল সদলবলে তাকে। তার দেখাশোনা পরিচর্যার ভার দেয়া হল প্রধান ওয়জীর মাসুম বে-র দীওয়ান বা প্রথম সচিব মহম্মদ বে-র ওপর। ইশিক অগসী (অনুষ্ঠান সচিব) এসে তার দলের সকলের নাম-ধাম লিখে নিলেন। লিখে নেয়া হল সঙ্গে থাকা ঘোড়ায় সংখ্যাও। তারপর তার প্রহরীদের ঘরোয়াভাবে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, নতুন আদেশ না মেলা পর্যন্ত যেন সীদী আলী ও তার সঙ্গীদের ওপর রাতের বেলা সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়।

সীদী আলী শুনতে পেলেন, আরো বিশদ তদন্ত না ক'রে মেসহদ থেকে তাদের ছেড়ে দেয়া ও এখানে আসার অনুমতি দেয়ার জন্য শাহ নাকি ভয়ানক রেগে গেছেন। এরূপ দায়িত্বহীনতার অপরাধে ককচী খলীফা ও মীর মুন্সী (মুখ্য সচিব)-কে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই খবর শোনানোর পরে পরেই কপচাজী (বর্ম রক্ষক) আলী বে যশৌল পীর আলীর নির্দেশে সীদী আলীর কাছে এসে বললেন: 'এখানকার লোকেদের উদ্দেশ্য খুবই খারাপ। যদি আপনার কাছে নগদ টাকাপয়সা থেকে থাকে তা আমার কাছে গচ্ছিত রেখে দিন। যদি ঈশ্বরের করুণাবলে বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন, ফেরৎ দিয়ে দেয়া হবে আপনার অর্থ। যদি খারাপ কিছু ঘটে তবে আপনার সম্পদ শত্রুরা কেন ভোগ করবে, বন্ধুরাই না হয় করুক।'

শুনে সীদী আলী উত্তর দিলেন: যারা এরূপ দীর্ঘকাল বিদেশ-বিভুঁয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা কখনো নগদ অর্থ সঙ্গে নিয়ে ফেরে না। আবার, মরণ কি বিপদ আপদকে যারা ভয় করে সে-রকম লোকও কখনো ঘর ছেড়ে বাইরে পা দেয় না। আমি কোরানের এই

কথাটিতে বিশ্বাসী : 'যার মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়ে গেছে কারো ক্ষমতা নেই তা ঠেকিয়ে রাখে। আর, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কারো জীবন নাশ সম্ভব নয়।'

সীলমোহর করা থলিতে পাঠান কাগজ পত্রাদি শাহ্ পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। যে দুই বেগম সীদী আলীর সঙ্গে একত্রে এসেছেন তারাও শাহের কাছে সীদী আলীর অনুকূলে মত প্রকাশ করলেন। অন্যদিকে সীদী আলীও শাহের মন জয়ের চেষ্টায় একটি চতুর্পদী কবিতা লিখে ভেট পাঠালেন তাকে। সেটিও তাকে বেশ আকৃষ্ট করল। সীদী আলীকে মুক্ত ক'রে দেয়ার আদেশ দিলেন তিনি। আপন ওয়কীল মাসুম বে-কে নির্দেশ করলেন এক ভোজসভা ক'রে তাকে আপ্যায়নের জন্য। ঠিক করা হল, এই ভোজসভার পর শাহ নিজেই তাকে এক ভোজ দিয়ে আপ্যায়ন করবেন।

মাসুম বেগ (বে, বেগ ও অমীর সমার্থক) নিজে সেই সুসংবাদ নিয়ে সীদী আলীর কাছে এলেন। জানালেন: আপনি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত, এদেশে অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারেন। তাছাড়া তুরস্ক সরকার-এর কাছে অল্প-দিনের মধ্যেই আমরা এক দূত পাঠাতে চলেছি, আপনিও চাইলে তার সঙ্গী হতে পারেন। অজরবাইজান অর্থাৎ তাবরিজ ও ভন হয়ে যাবে সে।

সীদী আলী জানালেন: শীতকালে ভনের সড়ক ধরে যেতে যে দারুণ কষ্ট সহ্য করতে হবে তা তার পক্ষে মোটেই আকর্ষণীয় নয়। শাহ্ যদি অনুগ্রহ ক'রে তাকে বাগদাদের পথ ধরে ভ্রমণ করার অনুমতি দেন তাহলে বাধিত হবেন তিনি।

শাহ সহৃদয়তার সঙ্গে তা মঞ্জুর করলেন।

মুক্তির দিনেই মাসুম বে সীদী আলীকে ভূরি ভোজে আপ্যায়ন করলেন। পরদিনই ভোজের নিমন্ত্রণ এল শাহর কাছ থেকে। যৎসামান্য কিছু উপহার নিয়ে উপস্থিত হলেন সীদী আলী। কিছুক্ষণ দুজনে কাব্য চর্চা করলেন। হল অন্যান্য নানা বিষয়

নিয়ে আলোচনাও। এক সময়ে শাহ্ তার সভাসদদের দিকে দৃষ্টি মেলে বললেন : "এদের চক্রান্তকারী বলে মনে করার মতো কোন কিছু তো দেখছিনে। বরং বলা যেতে পারে এরা নেহাৎই তীর্থযাত্রী, ধর্মপাগল।"

শাহর এই অভিমতের ফলে ককচী খলীফা ও মীর বক্সী আবার স্বপদ ফিরে পেলেন। সীদী আলীকেও একটি ঘোড়া, দুই প্রস্থ পোশাক, বেশ কয়েক থান রেশম এবং আরো কতক সামগ্রী উপহার দেয়া হল। দুই সর্দারের প্রত্যেককে দেয়া হল দুই প্রস্থ সম্মানী পোশাক। এবং পাঁচজন ভ্রমণ সঙ্গীর প্রত্যেককে একপ্রস্থ ক'রে পোশাক। সব মিলিয়ে শাহ্ বেশ চমৎকার ব্যবহারই করলেন তাদের সঙ্গে। তুরস্কের পাদশাহের প্রতিও যথেষ্ট সম্ভ্রম সূচক মনোভাব দেখালেন।

একদিন শাহের দেয়া আরেকটি ভোজ সভায় সীদী আলীও আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত। অনুষ্ঠানের আসর সুপ্রশস্ত সঙ্গীত মহাকক্ষ। রাজবংশীয় সকল বে বা অমীররাই তাতে যোগ দিয়েছেন। অতি জাঁকজমকের সঙ্গে করা হচ্ছে অনুষ্ঠানটি। শুধু আসর সাজাতেই ৫০০ থেকে ১০০০ তুমান ব্যয় করা হয়েছে। ভেলভেট এবং রেশমের বুটিতোলা কার্পেটই কয়েকশো। সে সব কার্পেটের বুকে রঙ দিয়ে কিংবা সূচীকাজের সাহায্যে নানারকম মূর্তি আঁকা। প্রচুর দামী দামী সব শৌখীন গদি, রুচি-সৌষ্ঠব মণ্ডিত মনোহরদর্শন সব তাঁবু, শামিয়ানা ও চাঁদোয়া।

যুজবাশী (একশ সেনার নায়ক) হসন বে শাহের বিশ্বাস-ভাজনদের মধ্যে একজন। তিনি সীদী আলীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন : একেবারে কুবের পুরীর চেহারা, তাই না?

তা ঠিক। সায় দিলেন সীদী আলী। পরক্ষণে মন্তব্য করলেন : তবে, রাজা-পাদশাদের ঐশ্বর্যের বহর সোনাদানার পরিমাণ দিয়ে বিচার করা হয় না। তা করা হয়ে থাকে তার সামরিক ক্ষমতা দিয়ে।

এ জবাবে চুপ মেরে গেলেন তিনি। এরপর আর এ প্রসঙ্গের ধারে কাছেও গেলেন না।

পারসিক রাজদূত ইতিমধ্যে তাবরিজ থেকে তুরস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। তাই সীদী আলীর যাত্রা মঞ্জুর করা হলেও, তখুনি চলে যেতে দেয়া হল না। তাকে আরো মাসখানেকের মতো থেকে যেতে বাধ্য করা হল। শাহ তাকে যথেষ্ট আদর যত্ন সমাদর দেখিয়ে চললেন, তার সান্নিধ্য লাভের প্রচুর সুযোগ পেলেন সীদী আলী।

একদিন শাহ প্রশ্ন তুললেন: বোরক খানকে সাহায্য করার জন্য তুরস্ক থেকে তিনশো আধুনিক সেনাকে পাঠান হল কেন?

সীদী আলী চতুরভাবে উত্তর দিলেন: বোরক খানের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে ওদের পাঠান হয়নি। পাঠান হয়েছিল আসলে প্রয়াত শেইখ আবদুল লতীফকে নিরাপদে তুরান পৌঁছে দেয়ার জন্য তার দেহরক্ষী হিসাবে। সকলেই জানেন, ঐ সময়ে পুণ্যশ্লোক আহমদ যশভীর পুত্র বাবা শেইখকে অস্ত্রখান থেকে ফেরার পথে সারকসিয়ানরা হত্যা করে। পথঘাট সম্পূর্ণ নিরাপত্তাশূন্য হয়ে পড়েছিল। তাই এ পদক্ষেপ নেন সম্রাট। নইলে, সামরিক সাহায্য দেয়াই যদি সম্রাটের উদ্দেশ্য হত, তবে তিনি মাত্র তিনশো আধুনিক সেনাকে পাঠাতে যাবেন কেন, হাজার কয়েককে পাঠাতেন বুখারায়।

আরেকবার ধর্মীয় গোষ্ঠী বিতর্কে জড়িয়ে ফেলা হল সীদী আলীকে। এবং শাহের এক আত্মীয় ও ঋষি তুল্য ব্যক্তি মীর ইব্রাহীম সফবীর সঙ্গে।

ইব্রাহীম প্রশ্ন করলেন: তুরস্কের বিদগ্ধ মহল আমাদের বিধর্মী বলে কেন?

সীদী আলী উত্তর দিলেন: শোনা যায়, আপনাদের এদেশের লোকেরা পয়গম্বরের অনুগামীদের লাঞ্ছিত করে। আর জানেনই

তো, আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে—যিনিই গুরুস্থানীয়দের অবমাননা করেন তিনিই বিধর্মী।

ইব্রাহীম বললেন—এ হল ইমাম অজম (ইবন হানিফ) এর অভিমত। ইমাম শফীর মতে এ জাতীয় ক্রিয়াকলাপ ক্ষমাযোগ্য অপরাধের পর্যায়ভুক্ত।

সীদী আলী উত্তরে বললেন: শুনেছি, পয়গম্বরের পত্নী আয়েসাকে কলঙ্কিনী রূপে অভিহিত করা নাকি আপনাদের মধ্যে একটি প্রথায় পরিণত হয়ে গেছে। এ হল পয়গম্বরের ভাবমূর্তির ওপর কালি ছেটানোর, পরম পবিত্রকে অপবিত্র করার সমতুল। স্বধর্মচ্যুত না হলে এ ধরনের কাজ কেউ করতে পারে না। এ জাতীয় ব্যক্তিদের জীবন-অধিকার হরণ যোগ্য। তাদের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও পরিবার পরিজনেরা কারাগারে স্থান পাবার উপযুক্ত।

ইব্রাহীম মন্তব্য করলেন: আমি এর প্রতিবাদ না ক'রে পারছি না। আয়েসার প্রতি যারা অসতীত্বের কলঙ্ক আরোপ করে আমরাও তাদের বিধর্মী বলে গণ্য ক'রে থাকি। এবং এ ধরনের কাজকে ঈশ্বর নিন্দা ও কোরান বিরোধিতা তুল্য মনে করি। কেননা, এই পবিত্র গ্রন্থ মধ্যেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আয়েসার সুগুণাবলী ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এ সত্বেও আলীর বিরুদ্ধতা করেছিলেন বলে আয়েসাকে আমাদের প্রীতির চোখে দেখা সম্ভব নয়।

এবার সীদী আলী প্রশ্ন ছুঁড়লেন: হাদীসে উলেমাদের ইসরায়েলী নবীদের সঙ্গে সমান মর্যাদার আসন দেয়া হয়েছে। এ সত্বেও কেন আপনারা উলেমাদের বিরূপ সমালোচনা করেন? এর কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনারা?

জবাবে ইব্রাহীম বললেন: উলেমা মধ্যে কি আমাদের উলেমারাও নেই?

সীদী আলী মন্তব্য করলেন: আপাতঃ ভাবে সব উলেমাদেরই

বোঝায় বটে। কিন্তু একথাও সর্বজনবিদিত যে 'উলেমাদের মাংস বিষবৎ, তার গন্ধ পীড়া-উদ্রেককারী, তা ভোজন মানেই মৃত্যু।' তাদের সম্পর্কে (শাস্ত্রে) এরূপ বলা হয়ে থাকার পরও যারা তাদের অবমাননা করতে সাহসী হন তারা শুধু ইহলোকেই নয়, পরলোকেও শাস্তি লাভের যোগ্য।

"এরপর ইব্রাহীমের মুখে আর উত্তর যোগাল না। আমিও আলোচনার গতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলাম।"

শাহ আরেকবার সীদী আলীকে প্রশ্ন করলেন: আপনি তো প্রচুর ঘুরেছেন। যত শহর এ পর্যন্ত দেখেছেন তার মধ্যে কোনটি আপনার সব থেকে ভাল লেগেছে?

সীদী আলী উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, পৃথিবীর অধিকাংশ শহরই দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। তবু ইস্তাম্বুল (কনস্তান্তিনোপল) ও গলত-এর সাথে তুলনা-করার মতো একটি শহরও চোখে পড়ল না এ পর্যন্ত।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইস্তাম্বুল হল তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানী। আর গলত সীদী আলী রঈসের জন্মস্থান।

শুনে, কোন মন্তব্য না ক'রে, শাহ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বললেন: তুর্কীর বে ও বেগলার-বে-দের সর্বমোট আয় তুমানে হিসাব করলে কত দাঁড়াবে বলে আপনার ধারণা?

সীদী আলী উত্তর দিলেন: 'তুর্কীর বে ও বেগলার-বে-রা তাদের পদের দায়িত্ব ও মর্যাদা অনুসারে বেতন পেয়ে থাকেন। এছাড়া আবার তারা ব্যক্তিগত আয়ের সুযোগ সুবিধাও ভোগ করেন। অন্যান্য সব রাজ্যের শাসকেরা তাদের পদস্থ কর্মচারীদের বেতন দেন তাদের অধীন সেনাবাহিনীর বেতনের অনুপাত অনুসারে। যদি তুর্কী সম্রাটও তার বে ও অন্যান্য কর্মচারীদের এই রীতিতে বেতন দিতেন তাহলে তার পরিমাণ তুমানে কেন লাখেও প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, ব্যবহার করতে হয় কুলুর

(ক্রোড়) বা কোটির অঙ্ক। একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। রুমালিয়া, অনতোলিয়া, মিশর, হাঙ্গেরী, দিয়রবকির, বাগদাদ, ইয়েমেন ও অলজিয়ার্সের বেগলার-বে-দের এক একজনকে যে পরিমাণ বেতন দেয়া হয় অন্য যে কোন সুলতান তা তার সমগ্র সেনাবাহিনীর জন্য খরচ ক'রে থাকেন। অন্য সব বেগলার-বে-দের বেতনের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। আমাদের সরকারের উন্নত বনিয়াদের সঙ্গে কঠোর সঙ্গতি বজায় রেখেই এই বেতন দেয়া হয়। সব সময় অনিশ্চিতকর পরিবেশ বিরাজ করার দরুন খান ও সুলতানরা তাদের সেনাবাহিনীর বেতন দান ক্ষেত্রে (তুর্কী সরকারের তুলনায়) সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে থাকেন। কিন্তু তুর্কীতে সেনাবাহিনী সম্রাটের সম্পূর্ণ নিজস্ব। সব বেগলার-বে এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীরা সরাসরি সম্রাটের ভৃত্য। সম্রাটের নির্দেশই আইন। এবং তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কারো নেই।'

সীদী আলীর এই মন্তব্য সমান ভাবে তৎকালীন ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানেও অমীর, পদস্থ কর্মচারী কিংবা সেনা কাউকেই সরাসরি রাজকোষ থেকে মাইনে দেয়া হত না। বরাদ্দ করা হত জাগীর। সেনারা আবার যে অমীরের অধীন তারই কাছ থেকে নগদ অথবা জাগীর আকারে মাইনে পেতেন। সুতরাং রাজা বা সম্রাটের প্রতি তাদের সরাসরি কোন আনুগত্য ছিল না। অমীররাও সরাসরি মাইনে পেতেন না বলে তাদের আনুগত্যও সর্বদা সুনিশ্চিত ছিল না। অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে কিংবা সুযোগ পেলেই তারা স্বাধীন হবার চেষ্টা করতেন। অন্যদিকে রাজা বা সম্রাটেরও রাজ্যের বা তার ভূমির ওপর সার্বভৌম অধিকার ছিল না। রাজার আইন যা-ই হোক তাকে উপেক্ষা ক'রে অমীররা তাদের জাগীর এলাকায় নিজস্ব আইন বা স্বেচ্ছা-চারীতা খাটাবার সুযোগ পেতেন। সম্রাট আকবর এই

পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা করলেও বিশেষ সফল হননি। তার আমলেও অমীররা অনেকেই বিদ্রোহ করেছেন, স্বেচ্ছাচারী হয়েছেন। এমনকি অনেকে যে পরিমাণ সেনা, ঘোড়া ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের জন্য জাগীর পেয়েছেন তদনুযায়ী তা রাখেননি। দাখিলী সেনা বা সরাসরি রাজকোষ থেকে বেতন ও বাহন পাওয়া সেনা নিয়োগ ব্যবস্থা আংশিকভাবে আকবর পরে করলেও তা ছিল কাগজে-কলমে, বাদশাহী সৈন্যের বিপুল সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য।

এই এক আসরেই শাহের কতক পদস্থ কর্মচারী সীদী আলীকে প্রশ্ন করলেন মেসহদে ইব্রাহীম মীর্জা তার যে সব কাগজপত্র আটক ক'রে শাহের কাছে পাঠিয়েছিলেন তা শাহ দেখেছেন কিনা?

সীদী আলী এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিলেও এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোন কিছু আলোচনার আগ্রহ দেখালেন না। কথায় আছে 'যে লোক কবর খুঁচিয়ে শয়তানকে জাগাতে চায় তার ওপর যেন অভিশাপ ঝরে পড়ে।' অতএব এ প্রসঙ্গ ধামাচাপা দিয়ে অন্য কথায় মাতলেন তিনি।

এরপর একদিন একটি গজল উপহার দিয়ে শাহের কাছে যাত্রারম্ভের অনুমতি প্রার্থনা করলেন সীদী আলী। সে প্রার্থনা শাহ মঞ্জুর করলেন। 'আপন অটুট শ্রদ্ধা ও অনুরক্তির প্রকাশ সহ তুর্কী সম্রাটের কাছে একখানি পত্র লিখে' তা দিলেন সীদী আলীর কাছে। দিলেন নানা বিদায় উপহারও তাকে। যুজবাশী হসন বে-র ভাই নজর বে-কে আদেশ করলেন সীমান্ত পর্যন্ত নিরাপদে এগিয়ে দেয়ার জন্য তার সঙ্গী হতে।

রবিউল অওয়াল মাসের আরম্ভে কজভিন থেকে বাগদাদ যাবার জন্য যাত্রা করলেন সীদী আলী।

সুলতানীর কাছে তারা অভর অতিক্রম করলেন। থামলেন

অখি অত্তরনের পুত্র পীর মহম্মদের সমাধি দর্শনের জন্য। গেলেন তারপর কিরকান। সেখানে খাজা আহমদ যশভীর পুত্র মহম্মদ দমতেজের সমাধি দর্শনের পর আবার যাত্রা শুরু করলেন। এলেন দরঘজিন, এলেন হুমদন। তীর্থ করতে গেলেন হুমদনে পয়গম্বরের দুই বর্ম বাহক আইন-উল-কুজত ও আবুললাই এর সমাধিতে। পরবর্তী বিরতি স্থান সয়দাবাদে শাসনকর্তা এসে দেখা ক'রে গেলেন সীদী আলীর সাথে। যথেষ্ট আদর যত্ন ও আতিথেয়তা দেখালেন।

এরপর (সুরিস্তানের) অলিবন্দ ও নিহাবন্দ পর্বত হয়ে পৌঁছলেন তারা বিস্তুন। যথারীতি সমাধি-তীর্থ করার পর যাত্রা শুরু ক'রে এলেন কসরি-শিরীন। তারপর কুর্দিস্তানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে পৌঁছলেন এসে জঙ্গীর দুর্গে।

"এখানে থাকাকালে দূর আকাশের বুকে হুমা পাখী দেখার সুযোগ পেয়ে তাকে পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে উৎসুক হয়ে উঠলাম। এ পাখির দর্শন লাভকে সৌভাগ্যজনক বলে মনে করা হয়। সুতরাং তার দেখা পেয়ে খুব খুশী হলাম সকলে। এ পাখি দর্শনে কি কি সৌভাগ্য লাভ হয় অনেকেই তা সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে গেছেন। অনেকে আবার বর্ণনা ক'রে গেছেন এ পাখিটির নিজস্ব রীতিনীতি, গুণাগুণ। শেষোক্ত দলের সযাদি এ নিয়ে যে সঙ্গীতটি রচনা করেছেন তা এরূপ ঃ

> পাখিদের কুলে হুমার না মেলে কোন তুলনা
> খেলেও সে হাড় ক'রে না শিকার উহু ভুলে না।

"একথা সকলেরই জানা যে এই পাখিটি শুধু অস্থির টুকরো খেয়েই জীবন ধারণ করে। প্রবাদ চালু আছে যে অস্থিটিকে টুকরো করার জন্য সে সেটিকে ঠোঁটে নিয়ে অতি উঁচু আকাশে উঠে যায় ও সেখান থেকে সেটিকে নিচে ফেলে দেয়। পড়ার আঘাতে তখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় সেটি। পাখিটি তখন মাটির বুকে নেমে

এসে সেই টুকরোগুলিকে সমান কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ক'রে নিয়ে একে একে তা গলাধঃকরণ করে। তার এই রীতিনীতি থেকেই এই প্রবাদ বাক্যটি জন্ম নিয়েছে যে 'পারসিক রাজকর্মচারীরা যখন পীড়ন ক'রে প্রচুর আদায় করতে পারে তখনই তারা তা নির্বিবাদে হজম করতে পারে।' তারা তখন হুমা পাখির পদ্ধতিতে সেই লুট করা সম্পদ সমানভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয়।"

জঙ্গীর পৌঁছে শাহের দেয়া নিরাপত্তা বাহিনী ও তার অধিনায়ক নজর বে-কে বিদায় দিলেন সীদী আলী। তারপর তোকুজ ওলাম বা নটি নদীর মিলিত প্রবাহকে অতিক্রম ক'রে এলেন বন (বা শেরি বন)। সেখান থেকে আবার পথ চলা শুরু ক'রে সেই একই মাস রবিউল সনির শেষ-নাগাদ উপস্থিত হলেন বাগদাদ।

বাগদাদের শাসনকর্তা খিজর পাশা সীদী আলীকে সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন, পরম আতিথেয়তা দেখালেন। কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকলেন না তিনি। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে যাত্রা করলেন মূল তুর্কী-ভূখণ্ডের দিকে।

॥ পনেরো ॥

টাইগ্রিস কূলে পৌঁছে জাহাজে চেপে নদী পার হলেন সীদী আলী। জমজী-উল মাসের সবে সুরু হয়েছে তখন। পরপারে এসে সে-অঞ্চলে থাকা পবিত্র সমাধিস্মারকগুলিতে আবার তীর্থ করতে গেলেন। করলেন তারপর আবার যাত্রারম্ভ। একের পর এক পার হলেন কসরী, সমকী ও হরবি শহর। এলেন তকরীত। তারপর সেখান থেকে মোসুল। এগিয়ে চললেন তারপর মোসুল ও জীজরীর পুরানো সড়কপথ ধরে নিসিবিন-এর দিকে।

নিসিবিন থেকে আবার যাত্রা শুরু ক'রে দিয়রবকির ও মরদিন হয়ে পৌঁছলেন অমেদ-এ। গেলেন সেখানে (শাসনকর্তা) ইস্কান্দার পাশার সঙ্গে দেখা করতে। অতি সমাদরের সঙ্গে সীদী আলীকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। আলোচনা প্রসঙ্গে আপন রোমাঞ্চকর ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কিছু কিছু অংশ তাকে শোনালেন সীদী আলী। অতি কৌতূহলের সঙ্গে নিবিষ্ট মনে তিনি তা শুনে গেলেন। তারপর উচ্ছ্বসিত ভাবে মন্তব্য করলেন 'তমুন দরি যত দেশ ঘুরেছেন আপনি দেখছি তাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। যে সব অভূতপূর্ব বিষয় বা বস্তু আপনি প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছেন তা বলকিয়া শাহ কি জিহান শাহেরও স্বপ্নের বাইরে।'

যে সব দেশে তিনি গেছেন সেখানকার রাজা-পাদশা ও তাদের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ইস্কান্দার পাশা প্রশ্ন করলে সীদী আলী জবাব দিলেন: 'সারা দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নেই তুর্কীর সঙ্গে যার তুলনা চলতে পারে, এমন কোন রাজা নেই যিনি আমাদের পাদশাহের সমকক্ষ, এমন কোন সেনাদল নেই যা তুর্কী বাহিনীর মতো সুযোগ্য। অটোমান সেনাবাহিনীর খ্যাতি পৃথিবীর পূর্ব

থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কেননা, যেখানেই তারা গেছে, সেখানেই তারা বিজয়-নিশান উড়িয়েছে। পৃথিবীর অন্তিম দিনটির আগমন কাল পর্যন্ত ঈশ্বর তুর্কীর এই সম্পদ ও সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখুন। আমাদের পাদশাহকে তিনি নিরোগ ও সুখে-শান্তিতে রাখুন। আমাদের সেনাবাহিনীকে চির-বিজয়ী করুন।'

পৃথিবীর ঐসব সুদূর প্রান্তের অধিবাসীরা এ দেশের নামের সঙ্গে পরিচিত কিনা ইস্কান্দার মীর্জা এ প্রশ্ন করলে সীদী আলী উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি যত না ভাবতে পারবেন তার চেয়েও বেশি।'

পরবর্তী আলাপ-আলোচনায় সীদী আলী জানতে পেলেন যে তুরস্ক সরকারের ধারণা তিনি মারা গেছেন। সেইরকম এক খবরই তার কাছে পৌছেছে। তা পৌছবার পর মিশরীয় নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষের পদ দেয়া হয়েছে রোডসের সঞ্জক বে-কুর্দজাদাকে।

তিনি আর মিশরীয় নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষপদে নেই একথা জেনে একটু যে দুঃখ না হল সীদী আলীর তা নয়। তবে মনে মনে তিনি ভাবলেন ঃ 'যাকগে, পাদশাহের কাছে পৌছলে আমি নিশ্চিতভাবে অন্য কোন পদ পেয়ে যাব। পাদশাহ দীর্ঘজীবী হোন্।' তারপর মানসিক সান্ত্বনা লাভের জন্য কবিতার ভাবসাগরে ডুব দিলেন তিনি।

এ সত্ত্বেও তার মস্তিষ্ককে সব সময় আচ্ছন্ন ক'রে রাখল হরমুজ ও গুজরাট বিজয়ের চিন্তা। তা দেখে তিনি মনে মনে নিজেকে বললেন; 'এই আজব স্বপ্ন তোমার মগজে এমন ভাবে বাসা বেঁধেছে যে তার চাপেই তুমি মাটিতে কুপোকাৎ হয়ে পড়বে। ভ্রমণের আকাঙ্খাও তোমার মধ্যে এত প্রবল যে মাটির বুকে ধূলি হয়ে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত তা কিছুতেই তোমাকে বিশ্রাম নিতে দেবে না।'

'দু চোখ ভরে আবার কনস্তান্তিনোপল (ইস্তাম্বুল)-কে দেখার তৃষ্ণা নিয়ে' পুনর্বার যাত্রা শুরু করলেন সীদী আলী। অরঘিনি-তে উপস্থিত হয়ে গেলেন নবী জিলককলের সমাধি দর্শনে। তারপর সেখান থেকে খরপুট হয়ে এলেন মলতিয়া। দর্শন করলেন সঈদ ঘাজী সুলতানের সমাধি। তারপর আবার যাত্রারম্ভ ক'রে অল্পদিনের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন সিওয়স, স্পর্শ করলেন মূল তুরস্কের মাটি।

শাসনকর্তা আলী পাশা সিওয়সে সাদর আপ্যায়ন জানালেন সীদী আলীকে। সামান্য কয়েকদিন সেখানে বিশ্রাম নিলেন তিনি। গেলেন আবদুল ওয়াহব গাজীর সমাধিতে তীর্থ করতে, আলী বাবাকে দর্শন ক'রে তার আশীর্বাদ নিতে।

যাত্রা করলেন এরপর ইস্তাম্বুল। পার হলেন কেন থেকে কর হিসার বহরম শাহ পর্যন্ত প্রসারিত সমতল ভূমি। তারপর বোজুক হয়ে হাজী বকতাস এলেন। অভ্যাসমতো যথারীতি তীর্থ করলেন বিভিন্ন শেইখ ও সন্তদের সমাধিতে। পৌঁছলেন তারপর কিরশহর। সেখানেও তীর্থ সেরে গেলেন অয়স বরসক এবং তারপর অনগোর। চশনঘির সেতু দিয়ে পার হলেন কিজিল ইরমাক (হেলিস) নদী। উপস্থিত হলেন বে-বাজারী-তে। সারলেন তীর্থ। করলেন জনবী পাশার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। তারপর যাত্রা শুরু ক'রে এসে গেলেন বোলি সেখান থেকে মোতুর্ন হয়ে কুনিক উপস্থিত হলেন। গেলেন সমাধিতে তীর্থ করতে। এরপর সেতুর ওপর দিয়ে শকরিয়া নদী পার হয়ে এলেন তরকলি য়ানিজ ও কিভায়। তারপর অগজ-দেনিজ হয়ে সবঞ্জ ও ইজনিকমিদ (বর্তমানে ইসমিদ)। নবী খাজার সমাধি দর্শনের পর এলেন ঘকিবিজ এবং সেখান থেকে স্কুতারি তারপর বসফোরাস প্রণালী পার হয়ে পা রাখলেন কনস্তান্তিনোপল বা ইস্তাম্বুলের মাটিতে।

"ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ। বহু বিচিত্র বিপদের মধ্যেও তিনি

আমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন পৃথিবীর সব দেশের সেরা, সব থেকে সুন্দর আমার এই আপন দেশে। একটানা চার বছর বাইরে বাইরে কেটেছে আমার এবং নিদারুণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে পার হতে হয়েছে এ বছরগুলি। মুখোমুখি হতে হয়েছে নানা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির। কিন্তু, বর্তমানে, হিজরী ৯৬৪ অব্দের (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) রজব মাসের প্রারম্ভে আবার ফিরে এসেছি আমার আপন দেশবাসী, আপন আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে।"

তুর্কীর মহামান্য পাদশাহ, সুলেইমান দি ম্যাগনিফিসেন্ট, বা রাজ-শ্রেষ্ঠ সুলেইমান তখন এড্রিয়ানোপল-এ। তাই, ইস্তাম্বুল পৌঁছে পরদিনই মীর সীদী আলী রঈস সেখানে যাত্রা করলেন। উপস্থিত হলেন তার কাছে আপন শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। সম্রাট খুশী হলেন তাকে দেখে। অতি সহৃদয়তার সঙ্গে স্বাগত জানালেন তার উপস্থিতিকে। সর্বোচ্চ ওয়জীররা এবং বিশেষভাবে রুস্তম পাশা উদার অনুগ্রহ দেখালেন তার প্রতি। দেয়া হল তাকে সম্রাটের অন্যতম মুতফেরিক বা পরিচর্যাকারীর পদ। বেতন ধার্য হল দৈনিক ৬০ অথচী। তার ভ্রমণ সঙ্গীদের মধ্যে কেতখুদা (দল নায়ক)-কে দেয়া হল মিশরের মুতফেরিকের পদ। তার মাইনেও দৈনিক ৮ অথচী বাড়িয়ে দেয়া হল। বোলুক-বাশীদের মধ্যে একজনেব মাইনে ধার্য হল দৈনিক ৮ অথচী। অন্যান্য সব ভ্রমণ সঙ্গীদেরও সাধারণ মাইনের ওপর দৈনিক ৬ অথচী ক'রে বাড়তি দেয়া হল। পরে এদের একজন মিশরীয় চৌশের পদে নির্বাচিত হলেন। অন্যরা যোগ দিলেন স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীতে। যে চার বছর তাঁরা বাইরে কাটিয়েছে তার বেতনও দেয়া হল তাদের মিশরীয় কোষাগার থেকে।

রজব মাসের শেষদিকে সম্রাট কনস্তান্তিনোপল ফিরে এলেন। নিয়োগ করলেন তাকে দফতরদার-ই-দিয়রবকির বা দিয়র-বকিরের সেনাবিভাগীয় অর্থদপ্তরের তত্ত্বাবধায়কের পদে।

সঙ্গী-সাথীদের অনুরোধে তার এই ভ্রমণ বিবরণী রচনায় ব্রতী হন সীদী আলী। রচনার কাজ সমাপ্ত করেন তিনি তার জন্মশহর গলত-এ বসে এই বছরেরই (হিজরী ৯৬৪ বা খ্রীষ্টাব্দ ১৫৫৬) শবান মাসে। প্রতিলিপি লেখার কাজ শেষ হয় তার পরের বছরের সফর মাসে।

শব্দসূচী

জাতি ও ব্যক্তি নাম

নদী, পর্বত, দেশ